عِرْفَانِ شَرِيْعَت

ইরফানে শরিয়াত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ
অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ-বিসিএস)

লেখকের গ্রন্থসমূহ

- বাংলা বোখারী শরীফ সংকলন
- রাহমাতুল্লিল আলামীন
- নূরনবী (দঃ)
- প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল
- ইরফানে শরিয়াত
- কালেমার হাকীকত
- আহকামুল মাযার
- ইসলাহে বেহেস্তী জেওর
- শিয়া পরিচিতি
- মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ফতোয়ায়ে ছালাছীন
- ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী
- সফর নামা আজমীর
- ফতোয়ায়ে ছালাছা
- ফতোয়ায়ে হারামাঈন
- গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- কারামাতে গাউল আ'যম
- বালাকোট আন্দোলনের হাকীকত
- মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা

عِرْفَانِ شَرِيْعَتْ

ইরফানে শরিয়ত

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এমএম-এমএ-বিসিএস)

عِرْفَانِ شَرِيْعَتْ

ইরফানে শরিয়ত

মূল ঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

(এম এম-এমএ-বিসিএস)

গ্রামঃ আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার

উপজেলাঃ মতলব (উত্তর), জিলাঃ চাঁদপুর

❖

প্রকাশনায় ঃ

MR. ZIAUR RAHMAN

70,Heathfield Road

Birming Ham,U.K

Tel: 0121-5519495

❖

প্রথম প্রকাশ ঃ

১লা এপ্রিল, ২০০৭ ইসায়ী

১৮ চৈত্র, ১৪১৮ বাংলা

❖

স্বত্ব ঃ অনুবাদক

❖

প্রচারে ঃ সুন্নী গবেষনা কেন্দ্র

❖

প্রাপ্তিস্থান ঃ

❖ উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা

❖ মোহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম

❖ ৩/৯ এফ ব্লক, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

❖ ১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ৯১১১৬০৭, ০১৭১১-৪৬৯২০৩

❖

মুদ্রণ ঃ

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস

২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৩৫৫৭৩৭, ০১৭১১-১৭৬৭২৩

❖

হাদিয়া ঃ ১৩০ টাকা, $-10

প্রাপ্তিস্থান ঃ আ'লা হযরত মাযার শরীফ, বেরলী,ভারত

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শতকোটি প্রশংসা এবং হাবীবে কিবরিয়া হযরত মুহামদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বেশুমার দরূদ আরয করার পর-

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত উর্দূ কিতাব "ইরফানে শরিয়ত" বাংলায় অনুবাদ করার জন্য ওয়ালসল প্রবাসী নবীপ্রেমিক মোহাম্মদ আহাদ মিয়া আমাকে একটি কপি সরবরাহ করেন ২০০৪ সালে। তিনি আমাকে একাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার প্রেরণায় গ্রন্থখানার অনুবাদে হাত দেই।

অনুবাদে হাত দিয়ে অনুভব করলাম- কিতাবখানার ইবারত এত সংক্ষিপ্ত ও এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, তার প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করা আমার মত অধমের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার। আ'লা হযরতের জওয়াব এত ইঙ্গিতপূর্ণ যে, হুবহু শাব্দিক অনুবাদ করলে তা জনগণের বোধগম্য নাও হতে পারে। তাই সরল অর্থে অনুবাদের দিকে মনোযোগী হলাম এবং মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হলাম।

অনেক পর্যালোচনা ও বার বার সংশোধনের মাধ্যমে অনুবাদ কাজ সমাপ্ত করেছি ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। সুন্নীবার্তায় পর্যায়ক্রমে তা প্রকাশ হতে থাকে। ইতিমধ্যে ছাপার মনস্থ করলেও আর্থিক প্রশ্নে বিলম্ব হতে থাকে। বার্মিংহামের আহলে সুন্নাহ্ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারী যিয়াউর রহমান তার মরহুম পিতার রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে এবং সুন্নী আক্বিদা প্রচারের লক্ষ্যে আংশিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। বাকী অংশের সুব্যবস্থা না থাকা স্বত্বেও আ'লা হযরতের এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি জনগণের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার অদম্য বাসনায় ছাপার কাজে হাত

দেই। কেউ যদি আমার অন্যান্য গ্রন্থ ছাপার কাজে শরিক হতে আগ্রহী হন, তাহলে খুশী হবো এবং আরও গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ পাবো।

["ব্রাকেট"] এর মধ্যে কিছু টিকা ও মন্তব্য এবং প্রয়োজনীয় কিছু মাসআলা সংযোজন করেছি। এতে করে আ'লা হযরতের জওয়াব পাঠকবর্গ অতি সহজে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন এবং সহজভাবে পূর্ণমাসআ'লা বুঝে নিতে পারবেন বলে আশা পোষন করছি।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১২৭২-১৩৪০ হিজরী) ভারতীয় উপমহাদেশের এক অমূল্য রত্ন। শরয়ী মাছআলা মাছায়েল চুলচেরা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। আ'লা-হযরতের ইরফানে শরিয়ত, আহকামে শরিয়ত, ফতোয়ায়ে আফ্রিকা, ফতোয়া রেজভিয়া সহ অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ মহাসমুদ্র তুল্য। পাঠকগণ অত্র গ্রন্থখানা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা কত এবং ফতোয়া প্রদানের নিরপেক্ষতা কত সুক্ষ। আ'লা হযরতের অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে গেলে মানুষের চিন্তা-চেতনার আমুল পরিবর্তন ও সংশোধন হতে বাধ্য। ইসলামী বিপ্লব শুরু হয় লেখনীর মাধ্যমে। সুন্নীয়তের বিপ্লব হবে আ'লা হযরতের গ্রন্থ প্রচারের মাধ্যমে।

গ্রন্থের শেষের দিকে আ'লা হযরতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর জ্ঞান গরিমার প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক কারামত সংযোজন করেছি- যাতে পাঠকবৃন্দ তাঁর সত্যিকার মূল্যায়ন করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক আমাকে এবং পাঠকবৃন্দকে অত্র গ্রন্থের উছিলায় সঠিক রাস্তা নসিব করুন-আমীন!

বিনীত
অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ.জলিল
১লা এপ্রিল, ২০০৭ ইসায়ী
১৮ চৈত্র, ১৪১৩ বাংলা

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

১ মৃত স্ত্রীকে স্বামীর গোসল দেওয়া ১১
২ কুলখানীতে ছোলার ওজন বা সংখ্যা কত ১১
৩ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত ১১
৪ নামাযে লুঙ্গির প্যাঁচ খোলার হুকুম ১১
৫ লুঙ্গির নীচে লেংগুট পড়ে নামায পড়া ১১
৬ বিজলী চমকায় কেন? ১২
৭ নামাযে শুধু মোজাদীর পাগড়ী পরা ১২
৮ এক দিকে সালাম ফিরিয়ে ছাহো সিজদা ১২
৯ বিবাহ পড়ায়ে কাযীর টাকা দাবী করা ১২
১০ কাফেরদের নিকট থেকে সুদ নেওয়া ১২
১১ কাফেরের সাথে বসে খানা খাওয়া ১২
১২ হিন্দুদের খাদ্যে ফাতেহা পাঠ করা ১২
১৩ সাবালেগ হওয়ার বয়স ১৩
১৪ তিন বার অপবিত্র অবস্থায় মারা গেলে গোসল কতবার? ১৩
১৫ অলিগনের মধ্যে কার মর্যাদা বেশী? ১৩
১৬ মুজা পরিধান করে গোড়ালী ঢেকে নামায পড়া ১৩
১৭ বেতের লাঠি ব্যবহার করা ১৪
১৮ আহ্লে বাইত কারা? ১৪
১৯ হযরত ফাতেমার (রাঃ) নামে ফাতিহার বস্তু খাওয়া ১৪
২০ মাযারের উপর শামিয়ানা ১৪
২১ ফাতেহার সময় খাদ্য ও পানি সামনে রাখা ১৪
২২ দাঁড়ি বেঁধে নামায পড়া ১৪
২৩ বিশেষ প্রয়োজনে হারাম বস্তু খাওয়া ১৪
২৪ বিধর্মী সাধুগন আল্লাহ্র নৈকট্য পাবে কিনা? ১৫
২৫ অযুর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ১৫
২৬ নারীকে হুরের সাথে তুলনা করা ১৫
২৭ ফাতেহা দুয়াজ দাহামের সুরমা বা কাপড় পরা ১৫
২৮ স্ত্রীর আক্বীদা স্বামীর বিপরীত হলে সন্তান জারজ হবে কিনা ? ১৬
২৯ শরাব পান করা কি আল্লাহ্র পথের প্রতিবন্ধক? ১৬
৩০ কোমরে বেল্ট বেঁধে নামায পড়া ১৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩১ দাঁড়ি ও পায়ে খেজাব বা মেহেদী লাগানো ১৬
৩২ ফজর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে তিলাওয়াত করা ১৬
৩৩ ضاد হরফের উচ্চারণ ১৬
৩৪ কয় তালাকে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয় ? ১৬
৩৫ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের ঘরে থাকা ১৭
৩৬ ভুলে নাপাক শরীরে নামায পড়া ১৭
৩৭ সখ করে পুরুষেরা সোনা/চান্দির আংটি পরা ১৭
৩৮ নামাযীর কতদূর সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয? ১৭
৩৯ বিড়াল, কুকুর জিনিসপত্র কামড়িয়ে খেলে হত্যা করা ১৮
৪০ হযরত ফাতিমার (রাঃ) নামে ফাতিহার বস্তু ঢেকে রাখা ১৮
৪১ হিন্দু কসাইয়ের দোকানের গোস্ত খাওয়া ১৮
৪২ নামাযের মধ্যে কোন ছুন্নাত ছেড়ে দেওয়া ১৮
৪৩ দুই ঈদে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম কেন? ১৮
৪৪ ফরয নামাযের শেষ দুই রাকআতে ক্বিরআত নেই কেন? ১৯
৪৫ হুক্কা বিড়ি সিগারেট পান করা দূরস্ত কিনা? ১৯
৪৬ মসজিদে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা ১৯
৪৭ ছবি পকেটে রেখে নামায পড়া ১৯
৪৮ মেয়েলোকের যবেহকৃত গোস্ত খাওয়া ১৯
৪৯ লা-মাযহাবী ওহাবীরা জোরে আমীন বলে কেন? ২০
৫০ ছুরি বা দা ছাড়া অন্য অস্ত্র দ্বারা যবেহ করা ২০
৫১ টাকা ধার দিয়ে লাভ বা বট্টা নেওয়া ২০
৫২ আক্বিক্বার পশুর হাড্ডি ভাঙ্গা ২০
৫৩ জুমা বা ঈদের দিনের ফজর কাযা থাকলে জুমা বা ঈদের নামায পড়া ২০
৫৪ খাদ্যে মহিলারা ফাতেহা দিতে পারবে কিনা? ২১
৫৫ সন্তানের আক্বিক্বার গোস্ত পিতা-মাতার খাওয়া ২১
৫৬ বিবাহ-শাদীতে দফ্ বাজানো ২১
৫৭ মহিলারা পুরুষকে ছালাম কিভাবে দিবে? ২১
৫৮ কোরআনে আল্লাহ্ কসম করেছেন কেন? ২১
৫৯ বিধর্মীকে সালাম দেওয়া ২২
৬০ কোরবানীর দিনে আক্বিক্বা দেওয়া ২২
৬১ নামাযের ক্বেরাতের মধ্যে দু'এক শব্দ বাদ দিয়ে পড়া ২২
৬২ মাছ এবং টিড্ডি পাখি যবেহ্ করা হয় না কেন? ২২
৬৩ কবরে তক্তা বা বাঁশ কোন্ দিক থেকে শুরু করা? ২২
৬৪ কোরআনে দাঁড়ি রাখার নির্দেশ আছে কিনা? ২২

৬৫ মিহ্রাবে ইমাম সাহেবের সাথে মুক্তাদীর দাঁড়ানো ২৩
৬৬ বলদ ও মহিষ দ্বারা কোরবানী জায়েয ২৩
৬৭ মুহররমে তাজিয়া বাহির করলে কাফের হবে কিনা? ২৪
৬৮ বিবি ছাকিনার (রাঃ) বিবাহ কার সাথে হয়েছিল? ২৫
৬৯ রাছুল (দঃ) কে তিনদিন বিনা গোসলে রাখার কথা মসনবী শরীফে আছে কিনা? ২৫
৭০ মুহররম শরীফে মর্সিয়খানীতে যোগদান করা ২৫
৭১ আল্লাহ্র দীদার নসীব হবে কিনা? ২৫
৭২ তাশাহ্হুদ পড়তে মোক্তাদীর বিলম্ব হওয়া ২৬
৭৩ সময় সংকীর্ন হলে ফজরের নামায নাপাক অবস্থায় পড়া ২৭
৭৪ চান্দ্রমাস পরিবর্তন হয়-কিন্তু হিন্দী মাস পরিবর্তন হয়না কেন? ২৭
৭৫ নামাযে মহিলাদের স্বর্ণালংকার পরা ২৯
৭৬ কলেরা হলে আযান দেওয়া ৩১
৭৭ বৃষ্টির জন্য আযান দেওয়া ৩১
৭৮ হাতীর শুঁড়ের পানি নাপাক কিনা ৩১
৭৯ হাতীর উপর সওয়ার হওয়া জায়েয কিনা ৩১
৮০ অযুর হাউজ ১০X১০ হাত হওয়ার অর্থ কি? ৩২
৮১ উস্তুনে হান্নানার জন্য নামাযে জানাযা ও দাফন হয়েছিল কিনা? ৩২
৮২ নবী করিম (দঃ) পর্দার অন্তরাল থেকে অহী পাঠাতেন কিনা? ৩২
৮৩ মুসলমান হয়ে হিন্দুদের ন্যায় একহাতে মালা রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ৩৩
৮৪ কাশেম নানুতবীর মুরিদ হয়ে পীরী-মুরিদী করা ও শাজারা বিতরণ করা ৩৪
৮৫ স্ত্রীর গহনার যাকাত কে দিবে? ৩৫
৮৬ স্ত্রীর গহনার যাকাত আদায়ের জন্য স্বামীর থেকে সোহরানার টাকা ধার নেওয়া ৩৫
৮৭ স্ত্রীর যাকাত আদায়ে টাকা ধার দিতে স্বামীর অস্বীকৃতি জায়েয কিনা? ৩৬
৮৮ পাথর বসানো গহনার স্বর্ণের ওজন কিভাবে করবে? ৩৬
৮৯ স্ত্রীর পক্ষে যাকাতের টাকা দান করতে স্বামী বা অন্য কেউ উকিল হতে পারবে কিনা? ৩৭
৯০ গরীবকে কত টাকা পর্যন্ত যাকাত দেয়া যাবে? ৩৭
৯১ হিন্দু মেলায় মুসলমান ব্যবসায়ী যেতে পারবে কিনা? ৩৮
৯২ দাফন করার পর কবরে আযান দেওয়া ৪২
৯৩ কোরআন মজিদ সর্বপ্রথম এক জিলদে একত্রিত করেছেন কে? ৪২
৯৪ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কি কোরআনের বিশেষ কপি ছিল? ৪৯
৯৫ সোনা-রুপা উভয়টি নেছাব পরিমাণ থাকলে যাকাত কিভাবে দিবে? ৪৯
৯৬ মসজিদের চাঁদা অন্য সৎ কাজে ব্যয় করা যাবে কিনা? ৫০
৯৭ শিয়াদের তুক্বিয়া বা দুমুখা নীতি জায়েয কিনা? ৫০
৯৮ বালা মুসিবতের জন্য যবেহকৃত পশুর চামড়া কি করবে? ৫১

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯৯ ফজর নামাযের মোস্তাহাব সময় কখন? ৫১
১০০ যোহরের সময় কয়টায় আরম্ভ হয়? ৫২
১০১ আছরের মোস্তাহাব সময় ৫৩
১০২ মাগরিবের আযান ও ইক্বামতের মধ্যখানে কতটুকু বিরতি? ৫৩
১০৩ ইক্বামতের সময় ইমাম ও মুসল্লিগন কখন দাঁড়াবে? ৫৩
১০৪ নামাযের মধ্য বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পড়লে ছাহো সিজদা লাগবে কিনা? ৫৩
১০৫ কাগজী নোট কর্জ দিয়ে বট্টা নেওয়া ৫৪
১০৬ ইমামের অযু ভাঙ্গলে প্রতিনিধি ইমাম ক্বিরাত কোন্‌খান থেকে শুরু করবে? ৫৪
১০৭ ইমামের "রাব্বানা লাকাল হামদ" পড়া জায়েয কিনা? ৫৫
১০৮ মিহ্‌রাবে ইমামের সাথে দুজন মোক্তাদী দাঁড়ালে কার মাকরূহ্ হবে? ৫৬
১০৯ শুধু ইমামের জন্য মোসল্লা বিছানো জায়েয কিনা? ৫৬
১১০ বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী তৈরী করলে উহার যাকাত দেওয়ার নিয়ম.... ৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড

১ অস্থায়ী চাকুরী স্থলে কছর নামায পড়তে হবে কিনা? ৫৮
২ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জানাযা ও দাফন কাফনে কারা শরিক ছিলেন? ৬০
৩ জুমার নামাযে সামনের কাতার ইমামের সামান্য পিছনে হলে কি হবে ৬০
৪ নবীজীকে ফখরে আলম বলা উচিত কিনা? ৬২
৫ "নূহ নবীর কিস্তি ডুবে যেত- যদি আমাদের নবীজী কাণ্ডারী না হতো" - এরূপ কবিতা রচনা করা ঠিক কিনা? .. ৬২
৬ চেহারা উন্মোচন করার আকুতি জানিয়ে "মুখড়া" শব্দ ব্যবহার করা ৬৩
৭ "নবীজীর প্রত্যেক বস্তুর কছম খেয়েছেন স্বয়ং মাওলা" এরূপ বলা জায়েয কিনা? ৬৩
৮ ফরয গোসলে বা তায়াম্মুমে নিয়ত করা কি? ৬৩
৯ গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া ৬৪
১০.১০X১০ হাত হাউজে মৃত জন্তু পঁচে গেলে নাপাক হবে কিনা? ৬৪
১১ সন্তান প্রসবের পর রক্ত বন্ধ হলে নামায পড়া ৬৫
১২ সংবাদপত্র বা ছোট পুস্তিকায় কোরআনের আয়াত লিখা থাকলে বিনা অযুতে ধরা যাবে কিনা .. ৬৬
১৩ অপবিত্র অবস্থায় সালাম দেওয়া ও নেওয়া ৬৬
১৪ নাপাক অবস্থায় ঘাম বেরিয়ে কাপড় সিক্ত হলে কাপড় নাপাক হবে কিনা? ৬৬
১৫ শীতকালে নামাযের সময় চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করা ৬৭
১৬ নামায শুরুর পরে আগত মুসল্লি একজন হলে কোথায় দাঁড়াবে?
লোক সামনের কাতার থেকে টেনে পিছনে আনা যাবে কিনা? ৬৮
১৭ নাপাক অবস্থায় পানাহার করার নিয়ম ৬৯
১৮ নাপাক শরীরে মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি কখন? ৭০
১৯ নাপাক শরীরে মসজিদের লোটা-বালতি ধরা ৭১
২০ পেশাব-পায়খানার উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা অযু করা ৭১

২১ খাদ্যে ইঁদুরের পায়খানা পাওয়া গেলে তার হুকুম ৭১
২২ কোরবানী বা আক্বীকার পশুর চামড়া বিক্রি করে মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করার নিয়ম ৭২
২৩-২৭ কবরস্থানের জায়গা বিক্রি করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো, কবরস্থান ধ্বংস করে রাস্তা তৈরী করা, কবরের উপর মসজিদ তৈরী করা, কবরস্থানে পেশাব করা এবং কবরস্থানের সম্মান করা ... ৭২
২৮ অলীগণের কবরে বাতি জ্বালানো জায়েয কিনা? ৭৪
২৯ পতাকা উড়িয়ে গজল গেয়ে ঈদগাহে দলবদ্ধভাবে যাওয়া ৭৪
৩০ মসজিদের ভিতরে কবর থাকলে নামায শুদ্ধ হবে ৭৫
৩১ "এজিদ ভাল লোক ছিল, তার বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনের যুদ্ধ অনুচিত ছিল"
এরূপ মন্তব্যকারীর হুকুম কি? ৭৮
৩২ নবীজীর অবমাননাকারী, তাঁর ইলমে গায়েব অস্বীকারকারী এবং
আকাবেরীনে দেওবন্দ- এর প্রশংসাকারীর হুকুম কি? ৮১
৩৩ মুসলমান নামধারী কাফের ও বাতিলপন্থীরা মুসলমানের মসজিদে যেতে পারবে কিনা? ৮৭
৩৪ বাতিলপন্থীর প্রতিরোধ করা হকপন্থী উলামাদের উপর ফরয ৮৯
৩৫ কোরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দেয়া যাবে-যদি ঐ নিয়তে বিক্রি করে ৯০
৩৬ কাউয়ালী পদ্ধতিতে বিনা বাদ্যে হামদ, নাত, গজল পরিবেশন জায়েয ৯২
৩৭ জামায় স্বর্ণ বা চান্দীর বুতাম ও চেইন ব্যবহার ৯৩

তৃতীয় খণ্ড

১ কবরের মাটির উপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া ৯৬
২ গরম পানি ঢেলে ছারপোকা মারা ৯৬
৩ দ্বীনী মাদ্রাসার জন্য কাফেরদের নিকট সাহায্য চাওয়া ৯৭
৪ পেশাব করে কুলুখ না নিয়ে শুধু পানি ব্যবহার করা ৯৭
৫ পর পুরুষের সামনে বিনা পর্দায় যাওয়া ৯৮
৬ শারিরিক অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয কিনা? ফরয হলে কি করবে? ৯৮
৭ ইমাম হাসান-হোসাইনকে হযরত আলী ও হযরত আবু বকরের উপর প্রাধান্য দেয় কারা? ৯৯
৮ হযরত আমির মোয়াবিয়া ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-সম্পর্কে কটুক্তি করে কারা ১০২
৯ নামাযে দরূদের আয়াত শুনে দরূদ পড়া ১০২
১০-১৫ যৌথ সম্পত্তি বন্টনের নিয়মাবলী ১০৩
১৬ স্ত্রী নিজ স্বামীর সম্পত্তি ও মোহরানার হক্বদার ১০৬
১৭ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্যের দ্বারা গর্ভবতী হলে ঐ ব্যক্তি তিন মাসা ইদ্দত্ শেষে
ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে সন্তান কার হবে? ১০৭
১৮ রোযা ও ঈদ কি পঞ্জিকা অনুযায়ী হবে-নাকি দর্শন অনুযায়ী? ১০৮
১৯ নামাযের তাশাহ্হুদে নবীজীর খেয়াল করা ও তাঁকে সালাম দেওয়া ১১০
২০ আহ্‌লে হাদীসপন্থীদের আক্বিদা ও আমল চার মাযহাবের খেলাফ ১১১
২১ ইমাম আবু হানিফার ইজতিহাদ হক্ব না জানলে কাফির ১১২

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে (রাঃ) গালি দানকারীর হুকুম ১১২
২৩ আহ্‌লে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের পিছনে হানাফীদের নামায নাজায়েয ১১২
২৪ আহলে হাদীস পন্থীদের কুফরী আক্বিদা সমূহ ১১৩
২৫ বাতিলপন্থীকে ইমাম পদে নিযুক্ত করা ১১৪
২৬ ফাছেক ও ফাজের ইমামের পিছনে নামায পড়ার হুকুম ১১৪
২৭ মুসলমানের মসজিদে ওহাবী ও বাতিল পন্থীদের প্রবেশাধিকার আছে কি? ১১৪
২৮ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসল্লিদের মতামতে ইমাম নিয়োগ ১১৫
২৯ শিয়া ইমামের পিছনে নামায নাদুরস্ত ১১৫
৩০ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা যোগ্যতার শর্তে ইমামতির অগ্রাধিকারী ১১৫
৩১ দেওবন্দের আকাবেরীনকে ভাল জানা কুফরী ১১৬
৩২ কবর যিয়ারত করা নারীদের জন্য জায়েয কিনা? ১১৮
৩৩ স্ত্রীর খারাপ আচরণে স্বামী নিজ সন্তানকে হারামী বলা ১১৯
৩৪ জারজ সন্তান ইমাম হওয়ার যোগ্য কিনা? ১২০
৩৫ বিবাহে শুধু মহিলা সাক্ষী হওয়া নাজায়েয এবং স্বাক্ষীর উপস্থিতি বাধ্যতা মূলক ১২০
৩৬ গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-মিলন ১২১
৩৭ স্বামী স্ত্রী হিসাবে মৌখিক পরিচিতি যথেষ্ট কিনা ? ১২২
৩৮ নাবালেগ ছেলে-মেয়ের বিবাহে অলীর অনুমতি এবং সাবালেগদের বেলায় তাদের সম্মতি প্রয়োজন ১২২
৩৯-৪৩ মে'রাজ রজনীতে হযরত বড়পীর (রাঃ) নবীজীর জন্য কাঁধ পেতে দেওয়া ও অন্যান্য ৫ ঘটনা ১২২
৪৪ ইমামত কি বংশগত অধিকার? ১৩৫
৪৫ ইমামতি কি মূর্খ সৈয়দের হক্ব- নাকি যোগ্য আলেমদের? ১৩৬
৪৬ আলেমকে উপেক্ষা করে গায়ের জোরে জাহেলকে ইমাম বানানো ১৩৬
৪৭ "নেককার ও বদকার-সকলের পিছনে নামায জায়েয"এই হাদীসের ব্যাখ্যা কি? ১৩৭
৪৮ মাদ্রাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করা বা বন্ধক রাখা ১৩৮
৪৯ মৃত্যু শয্যায় ওয়ারিশানদের মধ্যে একজনকে হেবা করা ১৩৮
৫০ নাবালেগ ছেলে ও মেয়ে কত বৎসরে বালেগ হয়? ১৩৮
৫১ নালায় প্রবাহিত বৃষ্টির পানি পাক কি না? ১৪০

পরিশিষ্ট

৫২ আ'লা হযরতের জীবনও কর্ম ১৪১-১৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

ইরফানে শরিয়ত

প্রথম খণ্ড

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাঃ)

ছাওয়াল-১ ঃ স্বামী মৃত স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে কি না এবং মৃত্যুর পর স্বামী তাঁর স্ত্রীর লাশ স্পর্শ করতে পারবে কি না?

জওয়াব ঃ মৃত স্ত্রীর কাফনের উপর স্পর্শ করতে পারবে এবং কবরেও নামাতে পারবে। কিন্তু খালী শরীর স্পর্শ করতে পারবে না সুতরাং গোসলও দিতে পারবে না। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-২ ঃ মৃত ব্যক্তির কুলখানীতে তৃতীয় দিনে পড়ার জন্য ছোলার পরিমান কত হওয়া বাঞ্ছনীয়? আর যদি শুকনো খেজুর হয়-তাহলে তার ওজন কত হওয়া উচিত?

জওয়াব ঃ শরিয়তে ছোলা বা খেজুরের কোন ওজন নির্ধারিত নেই। তবে ছোলা হলে সত্তর হাজার দানা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-৩ ঃ কোন মহিলাকে তালাক দেওয়ার পর কতদিন পর সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে?

জওয়াব ঃ তালাক দেওয়ার পর হায়েযওয়ালী মহিলা পূর্ণ তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ করতে পারবে। আর মহিলা যদি হায়েযওয়ালী না হয়-তাহলে তিনমাস পর। আর যদি গর্ভাবস্থায় তালাক হয়ে থাকে, তাহলে প্রসবের পর। উক্ত প্রসব যদি তালাকের ১ মিনিট পরেও হয় অথবা এক বছর পরে হয়, তাহলে প্রসবের পরপরই বিবাহ করতে পারবে। (এটাকে তালাকের ইদ্দত বলা হয়)।

ছাওয়াল-৪ ঃ নামাযের সময় লুঙ্গির প্যাঁচ খুলে নামায পড়া হয় কেন?

জওয়াব ঃ রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া ছাল্লাম নামাযে পরিধেয় কাপড় মোড়াতে নিষেধ করেছেন বলে। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-৫ লুঙ্গির নীচে লেংগুট বা হাফপেন্ট পরা থাকলে নামায দুরস্ত হবে কি না?

pdf By Syed Mostafa Sakib

জওয়াব ঃ নামায দুরস্ত হবে। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-৬ ঃ আকাশের বিজলী কি জিনিস?

জওয়াব ঃ মেঘমালা পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন ফিরিস্তা মনোনীত করেছেন- যার নাম রাআদ্। তার দেহ খুবই ছোট। তার হাতে একটি বড় কোড়া রয়েছে। যখন উক্ত ফিরিস্তা মেঘমালায় কোড়া মারেন-তখন তার সংঘর্ষে মেঘমালা হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়। উহাকে বিজলী বলা হয়। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-৭ ঃ নামাযের জামাআতে যদি কোন মোক্তাদীর মাথায় পাগড়ী থাকে-আর ইমাম সাহেবের মাথা পাগড়ীশূন্য থাকে, তাহলে নামায দুরস্ত হবে কি না?

জওয়াব ঃ নিঃসন্দেহে নামায দুরস্ত হবে। আল্লাহ্-ই-সর্বজ্ঞ। (তবে পাগড়ী পরিধান করলে সাওয়াব বেশী হয়-জলিল)।

ছাওয়াল-৮ ঃ একাকী নামায পড়ার সময় যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব কাজে ভুল বা ছহু হয়ে যায়, তাহলে কি একদিকে ছালাম ফিরিয়ে ছাহো ছিজদা দিতে হবে-না কি উভয় দিকে ছালাম ফিরিয়ে?

জওয়াব ঃ ওয়াজিব তরকের ক্ষেত্রে শুধু ডানদিকে ছালাম ফিরিয়ে দুটি ছাহো ছিজদা দিতে হবে। (ফরযে ভুল হলে নামায বাতিল হবে-জলিল)।

ছাওয়াল-৯ ঃ নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার বিবাহ পড়ায়ে টাকা পয়সা নেয়া দুরস্ত আছে কি না?

জওয়াব ঃ পূর্বে নির্ধারণ না করে অথবা জবরদস্তি ও বাধ্যতামূলক না করে খুশী হয়ে দিলে গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।
(বর্তমানে ফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে-তাই দাবী করে নিতে পারবে-জলিল)।

ছাওয়াল-১০ ঃ কাফেরদের নিকট কিছু ঋণ দিয়ে কোন মুসলমান সুদ নিতে পারবে কিনা? অবিভক্ত হিন্দুস্তান কি দারুল হরব- না কি দারুস সালাম?

জওয়াব ঃ সুদ এবং ঘুষ খাওয়া কোনরূপ শর্ত ছাড়াই হারাম। অবিভক্ত হিন্দুস্তান দারুল হরব নয়-বরং দারুস সালাম। (দারুল হরব বলা হয়-যেখান থেকে হিজরত করা কিংবা যুদ্ধ করা ফরয)।

ছাওয়াল- ১১ ঃ কাফেরদের সাথে বসে খানা খাওয়া জয়েয কিনা?

জওয়াব ঃ না, জায়েয নেই-বরং নিষিদ্ধ।

ছাওয়াল-১২ ঃ হিন্দুদের খাওয়ার বস্তুতে ফাতেহা পাঠ করা জায়েয কিনা এবং তাদের ঘরের প্রস্তুতকৃত খাদ্য খাওয়া দুরস্ত কি না?

জওয়াব ঃ উত্তম হলো মুসলমানদের প্রস্তুতকৃত খাদ্যে ফাতিহা পাঠ করা। হিন্দুদের রান্না করা গোস্ত হারাম। অন্যান্য খাদ্য যদি সন্দেহমুক্ত হয়- তাহলে খাওয়ায় কোন দোষ নেই। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-১৩ ঃ শরিয়তের বিধানমতে ছেলে এবং মেয়ে কখন বালেগ হয়?

জওয়াব ঃ ছেলের বেলায় অন্যুন ১২ বৎসর এবং মেয়ের বেলায় অন্যুন ৯ বৎসর হয়ে গেলে এবং আলামত পাওয়া গেলে শরিয়তের বিধান মতে ছেলে মেয়ে উভয়েই সাবালেগ/সাবালেগা হতে পারে এবং আলামত পাওয়া না গেলে উভয়ের ক্ষেত্রে ১৫ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়েকে বালেগ-বালেগা বলে গন্য করতে হবে। (সরকারী আইনমতে বর্তমানে ১৮ বৎসরে সাবালেগ গন্য করা হয়-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১৪ ঃ অপবিত্র অবস্থায় কোন মেয়েলোক মারা গেলে এক গোসলই কি যথেষ্ট-না কি দুই গোসল দিতে হবে?

জওয়াব ঃ এক গোসলই যথেষ্ট-যদিও তিনবার গোসল ওয়াজিব হোক না কেন। যেমনঃ মেয়েলোকের হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু গোসলের পূর্বে স্বামী সহবাস করেছে। সহবাসের গোসলের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় হায়েযের গোসল, সহবাসের গোসল ও মৃত্যুর গোসল-এই তিনটি একত্রিত হয়েছে। মৃত্যুর গোসলই সব গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-১৫ ঃ আউলিয়াগনের মধ্যে কার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী?

জওয়াব ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা বেশী। কেননা তিনি একই সাথে সাহাবী এবং অলী।

ছাওয়াল-১৬ ঃ মুজা পরিধান করলে পায়ের গোড়ালী তো ঢেকে যায়। এমতাবস্থায় কি নামাযের কোন ক্ষতি হবে?

জওয়াব ঃ না, এতে নামাযের কোন ক্ষতি বা মাকরূহ্ হবে না। (লুঙ্গি বা জামা উপর থেকে গোড়ালী ঢেকে ফেললে নামায মাকরূহ্ হবে-অনুবাদক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-১৭ ঃ বেতের লাঠি হাতে রাখা উচিত কি না?

জওয়াব ঃ বেতের লাঠি হাতে রাখা দোষনীয় নয়। কিন্তু চিকন, বাঁকা, মাথার অংশ লম্বা এবং বাম হাতে নিয়ে ছড়ির মত ঘুরানো শয়তানের স্বভাব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-১৮ ঃ আহ্‌লে বাইত বা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গ বলতে কাকে বুঝায়?

জওয়াব ঃ এখন আহ্‌লে বাইত বলতে প্রথমতঃ হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা বতুল রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশ বা আওলাদগণকে বুঝায়। তারপর হযরত আলী, হযরত আকিল, হযরত জাফর ও হযরত আববাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের আওলাদ বা বংশধরগণকেও আহ্‌লে বাইত বলে গন্য করা হয়। হুযুর পূরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পবিত্রা বিবিগণ-অর্থাৎ উম্মাহাতুল মোমেনীনগণও আহলে বাইত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (বিভিন্ন হাদীস ইহার প্রমাণ-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১৯ ঃ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামে প্রদত্ত ফাতেহার বস্তু খাওয়া পুরুষদের জন্য উচিত কি না?

জওয়াব ঃ খাওয়া উচিত। কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-২০ ঃ আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর শামিয়ানা দেওয়া জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ হাঁ, জায়েয। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ। (আহকামুল মাযারে দলীল দেখুন-জলিল)।

ছাওয়াল-২১ ঃ ফাতেহা পাঠের সময় খাদ্যের সাথে পানি রাখাও জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ হাঁ, জায়েয। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ। (বিস্তারিত দেখুন আহকামুল মাযারে-জলিল)।

ছাওয়াল-২২ ঃ নামাযের সময় শিখদের মত দাঁড়ি বেঁধে নামায পড়া জায়েয কিনা?

জওয়াব ঃ নিষিদ্ধ। কেননা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নামাযের সময় চুল বাঁধতে নিষেধ করেছেন।

ছাওয়াল-২৩ ঃ বিশেষ প্রয়োজনে হারাম খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয কি না?

জওয়াবঃ তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় হালাল খাদ্য পাওয়া না গেলে এবং মৃত্যু অনিবার্য মনে করলে এমতাবস্থায় যে পরিমান খেলে বা পান করলে জীবন রক্ষা পাবে, শুধু এ পরিমান হারাম খাদ্য বা পানীয় দুরস্ত আছে -এর অতিরিক্ত খাওয়া বা পান করা হারাম। তদ্রুপ, তীব্র শীতের সময় হারাম কাপড় ছাড়া হালাল কাপড় পাওয়া না গেলে। যদি হারাম বস্ত্র পরিধান না করে-তাহলে শীতে জীবন নাশের বা ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ প্রয়োজন-ততক্ষনের জন্যই হারাম বস্ত্র জায়েয হবে-এর বেশী সময় নয়।

ছাওয়াল-২৪ ঃ হিন্দু সাধুরা কি আল্লাহর সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌছতে পারে?

জওয়াব ঃ হিন্দু হোক-কিংবা অন্য কোন অমুসলিম হোক-তারা আল্লাহর গযব ও লানত পর্য্যন্তই পৌছতে পারবে। যদি কোন মুসলমান এই ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম গ্রহণ ছাড়াই কাফিরগণ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে- সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-২৫ ঃ অযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে পেশাব পায়খানার কাজে ব্যবহার করা দুরস্ত আছে কি না?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, দুরস্ত আছে, তবে উচিত নয়-আদবের খেলাফ।

ছাওয়াল-২৬ ঃ পার্থিব কোন বস্তুকে দ্বীনী কোন বস্তুর সাথে তুলনা করা জায়েয কি না? যেমন, কেউ বললো- অমুক মহিলা জান্নাতী হুরতুল্য।

জওয়াব ঃ এ ধরনের উপমা দেওয়া দোষনীয় নয়। তবে এ ধরনের উপমায় যদি দ্বীনী বস্তুর মানহানি ঘটে- তাহলে না জায়েয হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কুফরীও হয়ে যায়।

ছাওয়াল-২৭ ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল নামীয় সুরমা মহিলারা ব্যবহার করা বা ঐ নামের রং করা কাপড় ব্যবহার করা কি দোষনীয়?

জওয়াব ঃ শোকের নিয়তে ব্যবহার করলে হারাম হবে। অনুরূপভাবে মহররম মাসের ১০ তারিখ নামীয় সুরমা ব্যবহার করা এবং বিশেষ রং করা কাপড় পরিধান করাও হারাম। শোকের নিয়ত না হলে দোষনীয় নয়। (শিয়াদের মধ্যে এটি প্রচলিত-অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-২৮ ঃ স্ত্রীর আক্বীদা যদি স্বামীর আক্বীদার ভিন্ন হয়-তাহলে সন্তান হালাল হবে-নাকি জারজ হবে?

জওয়াব ঃ স্বামী অথবা স্ত্রীর বদ আক্বীদা যদি কুফরীর সীমা পর্য্যন্ত পৌছে-তাহলে সন্তান জারজ হবে-নতুবা হবেনা। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ। (যেমন বাতিল ফেকার কোন কোন বদ আক্বীদাধারী-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-২৯ ঃ শরাব পান করা কি আল্লাহর রাস্তার প্রতিবন্ধক?

জওয়াব ঃ অবশ্য অবশ্যই প্রতিবন্ধক। শরাব পানকারীর উপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করে থাকেন।

ছাওয়াল-৩০ ঃ কোমরে বেল্ট বেঁধে নামায আদায় করা জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, দুরস্ত আছে। তবে জামার নিচপ্রান্ত যেন বেল্টের নিচে না পড়ে।

ছাওয়াল-৩১ ঃ দাঁড়িতে খেযাব অথবা মেহেদী লাগানো জায়েয কিনা?

জওয়াব ঃ দাঁড়িতে খেযাব লাগানো হারাম। মেহেদী লাগানো জায়েয-বরং সুন্নাত। (যেহেতু দাঁড়িতে মেহেদী লাগানো সুন্নাত, সেহেতু পায়ে লাগানো হারাম-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৩২ ঃ ফজর নামাযের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ নিঃসন্দেহে জায়েয-বরং ঐ সময়টাই অতি উত্তম- যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়।

ছাওয়াল-৩৩ ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অনুসারীগন কোরআন শরীফের ضَادْ হরফ "দ্বোয়াও"-র ন্যায় উচ্চারণ করে কেন এবং শিয়া রাফেজীরা দ্বোয়াও-র ন্যায় উচ্চারণ করে না কেন?

জওয়াব ঃ ضَادْ হরফের উচ্চারণ "দ্বোয়া" এবং "যোয়া" উভয়টিই গলদ। ضَادْ হরফটি "আদরাছ" নামক দাঁত হতে উচ্চারিত হয়। মাখরাজ শিক্ষা করা ও অনুশীলন করা ফরয। রাফেজী শিয়ারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন মজিদের হরফ পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা কুফরী।

ছাওয়াল-৩৪ ঃ কত তালাক দিলে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

জওয়াব ঃ তিন তালাক দিলে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে যায়।

বিনা হিলায় স্বামীর জন্য পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল হবেনা। তিন তালাক না দিয়ে এক বা দুই তালাক "নিদিষ্ট শব্দ" দ্বারা দিলে বিবাহ ছুটে যায় সত্য-কিন্তু বিনা হিলায় পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। আর যদি বিনা বাসরে এক তালাকও দেয়, তাহলেও বিবাহ ছুটে যাবে- কিন্তু বিনা হিলায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে। (বিষয়টি খুবই সুক্ষ-অনুবাদক)

ছাওয়াল-৩৫ ঃ স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যদি স্ত্রী অন্য পুরুষের ঘরে চলে যায়- তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে কি না?

জওয়াব ঃ হাঁ, ঠিক থাকবে। তবে স্ত্রী গুনাহ্গার হবে।

ছাওয়াল-৩৬ ঃ শরীর নাপাক অবস্থায় পুরুষ বা স্ত্রী যদি ভুলে নামায আদায় করে এবং নামাযের পর স্মরণ হয়-তাহলে ঐ নামায কি পুনরায় পড়তে হবে?

জওয়াব ঃ অবশ্যই গোসল করে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। (কেননা, শরীর পাক হওয়া নামাযের একটি ফরয-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৩৭ ঃ সখ করে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষ লোকেরা সোনা চান্দির আংটি পরতে পারবে কিনা?

জওয়াব ঃ সোনার আংটি পুরুষদের জন্য শর্তহীনভাবে হারাম। রূপা বা চান্দির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আংটি- অথবা একটি আংটি যার উপরে কয়েকটি নমুনা থাকে, অথবা যার মধ্যে চার মাশা পরিমান রূপা থাকে- এমতাবস্থায় শুধু একটি আংটি ব্যবহার করা যাবে- যার উপর মাত্র একটি নমুনা থাকবে এবং চার মাশার কম ওজন হবে। এমন আংটি সখ করে অথবা সীল হিসাবে পুরুষ লোকেরা ব্যবহার করতে পারবে।

ছাওয়াল-৩৮ ঃ নামাযী ব্যক্তির কতদূর সামনে দিয়ে গেলে বা অতিক্রম করলে গুনাহ্গার হবে না?

জওয়াব ঃ ঘর অথবা ছোট্ট মসজিদ হলে ঐ ঘরের অথবা ছোট মসজিদের কেবলার দিকের দেওয়াল পর্যন্ত বিনা ছুতরায় অতিক্রম করা হারাম। মাঠ অথবা বড় মসজিদের বেলায় তিনগজ বা ছয় হাত সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। ৪৭/৪৮ গজ লম্বা মসজিদকে বড় মসজিদ বলা হয়। এর কম হলে ছোট মসজিদ বলে গন্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদই ৪৭ গজ বা ১৪১ হাতের চেয়ে কম-তাই ছোট মসজিদ হিসাবে গন্য-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৩৯ ঃ যদি বিড়াল, কুকুর-ইত্যাদি প্রাণী মানুষের জিনিসপত্র নষ্ট করে অথবা কামড়িয়ে খেয়ে ফেলে-তাহলে উহা মেরে ফেলা দুরস্ত হবে কি না?

জওয়াব ঃ যদি কামড়িয়ে খেয়ে ফেলে-তাহলে হত্যা করা দুরস্ত।

ছাওয়াল-৪০ ঃ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামে কোন বস্তু ফাতিহা দেয়ার সময় উহা ঢেকে রাখা উত্তম-নাকি খোলা রাখা উত্তম? (হিন্দুস্তানী নিয়ম)।

জওয়াব ঃ উভয় রকমই দুরস্ত।

ছাওয়াল-৪১ ঃ হিন্দু কসাইয়ের নিকট থেকে গোশত ক্রয় করে খাওয়া জায়েয কিনা? (এটা অমুসলিম দেশের ঘটনা-অনুবাদক)।

জওয়াব ঃ সাধারনতঃ হারাম। কিন্তু হিন্দু কসাই যদি কোন মুসলমান দ্বারা যবেহ্ করে বিক্রি করে এবং অন্যান্য মুসলমানও তার চোখের সামনে উক্ত গোশত খরিদ করে-তাহলে উক্ত গোশত খাওয়া জায়েয হবে।

ছাওয়াল-৪২ ঃ নামাযের মধ্যে কোন ছুন্নাত কাজ ছেড়ে দিলে ছাহো সিজদা দিতে হবে কি না।

জওয়াব ঃ নিয়ম হলো-কোন ওয়াজিব ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে ছাহো সিজদা দেওয়া ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। আর ফরয তরক করলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

প্রশ্নে বর্ণিত কোন ছুন্নাত কাজ ছেড়ে দিলে ছাহো ছিজদা করতে হয় না সত্য, কিন্তু মাকরূহ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শুরু হতে পড়া উত্তম। শরয়ী ওযর ব্যতিত সুন্নাত ছাড়া অভ্যাস করলে গুনাহগার হবে। (বাতিল ফের্কার লোকেরা ছুন্নাতের গুরুত্ব দেয় না। যে কোন বাহানা করে তারা ছুন্নাত ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করে নিয়েছে। যেমন তারাবিহ্ ও ফরয নামাযের পর দোয়া মুনাজাত- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৪৩ ঃ ঈদুল ফিতর ১ দিন এবং ঈদুল আযহার ৪ দিন-এই ৫ দিন রোযা রাখা হারাম হলো কেন?

জওয়াব ঃ এ দিনগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে মুমিন বান্দাদের জন্য যিয়াফতের দিন। তাই যিয়াফত না খেয়ে রোযা রাখা হারাম।

ছাওয়াল-৪৪ ঃ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে ছুরা ফাতিহা ও ক্বেরাত পড়া হয় এবং বাকী রাকআত গুলোতে ক্বেরাত পড়া হয় না। অথচ, চার রাকআত বিশিষ্ট ছুন্নাত বা নফল নামাযে সব রাকআতেই ছুরা ফাতেহা ও ক্বেরাত পড়তে হয়- এর কারণ কি?

জওয়াব ঃ মূলতঃ নামাযে শুধু দু'রাকআতেই কোরআন মজিদ থেকে তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। চার রাকআত বিশিষ্ট ছুন্নাত বা নফল নামাযের প্রতি দুই রাকআতই পৃথক পৃথক নামায। কাজেই প্রত্যেক দু'রাকআতেই ফাতেহার পরে ক্বেরাত পাঠ করা আবশ্যক। (ফরয নামাযের শেষের এক বা দু'রাকআত যেহেতু পৃথক নামায নয়- কাজেই এখানে ক্বেরাতকে সংযুক্ত করা জরুরী করা হয়নি- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৪৫ ঃ হুক্কা পান করা, আফিম সেবন করা, অথবা অন্য কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য খাওয়া বা পান করা জায়েয আছে কি না?

জওয়াব ঃ আফিম এবং এ ধরনের অন্যান্য নেশা জাতীয় জিনিস খাওয়া নিঃসন্দেহে হারাম। হুক্কায় এমনভাবে টান দেয়া-যাতে জ্ঞান হারা হয়ে যায়- যেমন রমযান শরীফে কোন কোন অজ্ঞ লোক করে থাকে-এটাও হারাম। আর যদি হুক্কা পান করলে জ্ঞান লোপ না পায়, তাহলে মোবাহ্। কিন্তু যদি গন্ধযুক্ত ও ঘন তামাক হয়-তাহলে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। (গন্ধযুক্ত মুখে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ্-অনুবাদক)

ছাওয়াল-৪৬ ঃ মসজিদে কেরোসিন তৈল বা মাটিয়া তৈল জ্বালানো জায়েয কিনা?

জওয়াব ঃ দুর্গন্ধের কারনেই কেরোসীন তৈল জ্বালানো হারাম। তবে যদি প্রসেস করে দুর্গন্ধ মুক্ত করাযায়, তাহলে জায়েয।

ছাওয়াল-৪৭ ঃ কোন প্রাণীর ছবি পকেটে রেখে নামায পড়লে নামায হবে কিনা?

জওয়াব ঃ পকেটে ছবি রেখে নামায পড়া দুরস্ত হয়ে যাবে। তবে এরূপ করা মাকরূহ ও অপছন্দনীয়-যদি বিনা প্রয়োজনে রাখে। আর যদি নোট হয়-তাহলে মাকরূহ নয়। কেননা ইহা প্রয়োজনীয় বস্তু।

ছাওয়াল-৪৮ ঃ মেয়েলোকের যবেহ করা পশু বা মুরগীর গোস্ত খাওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

জায়েয আছে কি না?

জওয়াব ঃ যদি মেয়েলোক যবেহের নিয়ম কানুন জানে-অর্থাৎ কণ্ঠ নালীর নীচে যবেহ করে-তাহলে জায়েয হবে।

ছাওয়াল-৪৯ ঃ আহ্‌লে হাদীসপন্থী ওহাবীরা নামাযে ছুরায়ে ফাতেহার পর জোরে আমীন বলে কেন?

জওয়াব ঃ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বিরোধীতা করে একটি পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা। (সউদী সরকারও ওহাবী সম্প্রদায়- জলিল)।

ছাওয়াল-৫০ ঃ চাকু বা ছুরি ব্যতিত অন্য কোন ধারাল অস্ত্র (বেলেড, খুর ইদ্যাতি) দিয়ে যবেহ্ করা জায়েয আছে কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, যদি উক্ত হাতিয়ার ধারালো হয় এবং শানদার হয়, তাহলে জায়েয হবে। এতে পশুর কষ্ট কম হবে।

ছাওয়াল-৫১ ঃ যায়েদ নামীয় কোন এক ব্যাক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু টাকা আমরকে ধার দিল এবং এই শর্ত করা হলো যে, ধারের টাকার যা মুনাফা হবে-তার অর্ধেক পাবে ঋণদাতা যায়েদ এবং অর্ধেক পাবে ঋণগ্রহীতা আমর। এমতাবস্থায় যায়েদের জন্য এই মুনাফা গ্রহণ করা সুদ বলে গন্য হবে কি না?

জওয়াব ঃ ধার হিসাবে দিলে মুনাফা নেয়া সুদ ও অকাট্য হারাম হবে। তবে ধার না দিয়ে যদি এই শর্তে ব্যবসায় নিয়োগ করে যে, টাকা যায়েদের এবং পরিশ্রম আমরের, আর মুনাফা ভাগ হবে অর্ধেক অর্ধেক-তাহলে জায়েয হবে।

ছাওয়াল-৫২ ঃ কোরবানী ও আক্বিক্বার পশুর হাড্ডি ভাঙ্গা উচিৎ কিনা?

জওয়াব ঃ হাড্ডি ভাঙ্গাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে আক্বিক্বার পশুর হাড্ডি না ভাঙ্গা অতি উত্তম।

ছাওয়াল-৫৩ ঃ জুমার দিনে অথবা ঈদের দিনে কেউ যদি ফজর না পড়ে জুমা অথবা ঈদের নামায পড়ে-তাহলে তার জুমা ও ঈদের নামায আদায় হবে কি না?

জওয়াব ঃ ঈদের নামায হয়ে যাবে। কেননা, ঈদের নামায ফরয নয়-বরং ওয়াজিব। আর জুমার ক্ষেত্রে যদি ঐদিনের ফজর সহ

৫ওয়াক্তের বেশী কাযা হয়ে থাকে-তাহলে আগে জুমা পড়া যাবে। আর যদি ৫ ওয়াক্তের কম হয়-তাহলে পিছনের কাযা আদায় না করে জুমা পড়লে তা আদায় হবে না। [অর্থাৎ তারতীবের বেলায় জুমা হবে না এবং তারতীব না থাকলে হবে]। পাঞ্জেগানা নামাযের বেলায় পূর্বের ওয়াক্তের কাযা নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্বেও যদি সময় সংকীর্ন হয়, তাহলে কাযা না পড়ে আগে ওয়াক্তের নামায পড়ে নিতে হবে। পরে কাযা আদায় করবে।

ছাওয়াল-৫৪ ঃ খাওয়ার বস্তু বা তাবাররুকের বস্তুতে মহিলারা ফাতেহা দিতে পারবে কিনা? (ফাতেহা বলা হয়- কোন বস্তু সামনে রেখে চার কুল ও দরূদ শরীফ পড়ে ছাওয়াব রেছানী করা ও বরকতের জন্য দোয়া করা-অনুবাদক)

জওয়াব ঃ জায়েয আছে, নিষেধ নেই। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-৫৫ ঃ সন্তানের আকিকার গোস্ত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী খেতে পারবে কি-না?

জওয়াব ঃ হাঁ, সবাই খেতে পারবে। (যেমন নিজের নামে কোরবানীর গোস্ত নিজে খেতে পারবে-জলিল)।

ছাওয়াল-৫৬ ঃ বিবাহ-শাদীতে দফ্ বা নহ্‌বত বাজানো জায়েয কি- না?

জওয়াব ঃ বিবাহ-শাদী অধিক প্রচার করার নিয়তে শুধু দফ্ বাজানো জায়েয- কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তবে উক্ত দফ্ ঝাঁঝাঁলো ও সূরেলা হতে পারবেনা এবং যে বাজাবে-সে কোন সম্মানী পুরুষ বা সম্মানী নারী হতে পারবে না। (যারা বলেন- দফ্ বা নহ্‌বত না বাজালে বিবাহ শুদ্ধ হবে না-তারা শিক্ষা গ্রহন করুন-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৫৭ ঃ মহিলারা যদি পুরুষ লোককে ছালাম দেয়-তাহলে কিভাবে দিবে?

জওয়াব ঃ মহিলারা আপন মাহারেম পুরুষ ব্যক্তিকে ছালাম দিতে পারবে এভাবে-"আসসালামু আলাইকুম"।

ছাওয়াল-৫৮ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে কসম করেছেন কেন?

জওয়াব ঃ কোরআন মজিদ আরবী বাগধারায় অবতীর্ন হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিলো-কোন বিষয়কে গুরুত্ব প্রদানের জন্য তারা কসম দ্বারা উক্ত বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ন করতো। এছাড়াও অন্য একটি কারণ হলো-নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে নবী করিম সাইয়্যেদুল মোরছালীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল ।এজন্য তারা হুযুরকে সাদিক ও আল-আমিন বলতো । তিনি যদি কসম বাক্য দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় বস্তুকে জোরদার করেন-তাহলে এর উপর আস্থা স্থাপন করা অবশ্যম্ভাবী । তাদের কাছে চূড়ান্ত প্রমাণ ও দলীল হিসাবে পেশ করার জন্য কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক নবীজীর জবান দিয়ে নিজের কসম বাক্য উল্লেখ করেছেন ।

ছাওয়াল-৫৯ ঃ কাফের ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া উচিৎ কি না?

জওয়াব ঃ হারাম হবে । (তারা সালাম দিলে শুধু "ওয়া আলাইকুম" বলা যাবে-অনুবাদক) ।

ছাওয়াল-৬০ ঃ কোরবানীর দিনে আক্বিক্বা করা জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, আক্বিক্বা করা জায়েয । (কোরবানীর সাথেও করা যাবে-অনুবাদক) ।

ছাওয়াল-৬১ ঃ ইমাম সাহেব ক্বেরাতের মধ্যে দু'এক শব্দ বাদ দিয়ে সামনে পড়লে নামায হবে কি না?

জওয়াব ঃ দু'এক শব্দ বাদ দেওয়ার কারণে যদি মূল অর্থের পরিবর্তন হয়-তাহলে নামায হবে না । অন্যথায় হবে ।

ছাওয়াল-৬২ ঃ মাছ এবং টিড্ডি পাখি যবেহ্ না করে কাটে কেন?

জওয়াব ঃ যবেহ করার উদ্দেশ্য হলো হারাম রক্ত প্রবাহিত করা । কিন্তু মাছ ও টিড্ডির মধ্যে হারাম রক্ত নেই-তাই যবেহ করতে হয় না ।

ছাওয়াল-৬৩ ঃ মৃত পুরুষ ব্যক্তির কবরের উপর তক্তা বা বাঁশ কোন্ দিক থেকে রাখা ভাল?

জওয়াব ঃ মাথার দিক দিয়ে শুরু করা উত্তম ।

ছাওয়াল-৬৪ ঃ কোরআন মজিদে দাঁড়ি রাখা বা না রাখার বিষয়ে উল্লেখ আছে কি না? যদি থাকে-তবে কোন্ আয়াতে? যদি হাদীসে থাকে, তাহলে হাদীসের সনদ কি?

জওয়াব ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন - أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى وَ خَالِفُوا الْمَجُوْسَ-
অর্থাৎ-মোছ খাটো করো, দাঁড়ি লম্বা করো এবং অগ্নি পূজকদের বিরোধীতা করো" । আমি ফকির (ইমাম আহমদ রেযা) নিজ গ্রন্থ-

لُمْعَةُ الْفُحّٰ فِىْ إِعْفَاءِ اللُّحّٰ- নামক গ্রন্থের মধ্যে কোরআন মজিদের ৫টি আয়াত এবং চল্লিশের চেয়েও অধিক হাদীস দ্বারা দাঁড়ি রাখার দলীলাদী পেশ করেছি (কোরআনে আছে-"রাসুল যাহা বলেন-তা মানো") ।

ছাওয়াল-৬৫ ঃ মোক্তাদীগণ মসজিদের মেহ্রাবের ভিতরে এবং ইমাম সাহেবের বরাবর দাঁড়ালে নামায দুরস্ত হবে কি না? যদি দুরস্ত না হয়, তাহলে নামায দোহ্রাতে হবে কি না?

জওয়াব ঃ মিহ্রাবে দাঁড়ানো মোক্তাদীগণের জন্য নিষেধ । দাঁড়ালে নামায হয়ে যাবে-কিন্তু গুনাহ্গার হবে । আর ইমামের বরাবর যদি ২ জন মোক্তাদী দাঁড়ায়, তাহলে নামায মাকরূহ তানজিহী- অর্থাৎ খেলাফে আওলা বা অনুত্তম হবে । আর যদি দুই জনের অধিক হয়, তাহলে মাকরূহ তাহরীমী হবে । এমতাবস্থায় নামায পড়ে থাকলে উক্ত নামায দোহরাতে হবে । বিস্তারিত বিবরন ফতোয়া রেজভীয়াতে দেখুন ।

ছাওয়াল-৬৬ ঃ বলদ ও মোটা তাজা মহিষ দ্বারা কোরবানী করা জায়েয কিনা? যায়েদ নামক এক ব্যক্তি বলছে-আমাদের শহরে, গ্রামে বা পরগনায় কোথায়ও বলদ দ্বারা কোরবানী করা হয় না। মানুষ যা করেন-সেটা মাকরূহ সমতুল্য। যায়েদের এরূপ মন্তব্য ঈমানের জন্য কি ক্ষতিকর?

যদি দুই বৎসর বা তদূর্ধ বয়সের মহিষ দ্বারা কোরবানী করা হয়, আর মহল্লাবাসী উহাকে খারাপ মনে করে গোস্ত গ্রহণ না করে-তাহলে গুনাহ্গার হবে কি না? বেরেলী শহরে কি বলদ দ্বারা কোরবানী করা হয়? আমর নামক জনৈক ব্যক্তির মন্তব্য হলো-আশি বৎসর ধরে বেরেলী শহরে বলদের কোরবানী হতে দেখিনি । তার কথা সত্য-না মিথ্যা?

জওয়াব ঃ বলদ অথবা মহিষ দ্বারা কোরবানী করা নিঃসন্দেহে জায়েয । এতে মাকরূহ হওয়ার কিছুই নেই । তাই যায়েদের দাবী সঠিক নয় । আর মাকরূহ মনে করলেও তাতে ঈমানের জন্য কোন ক্ষতি হবেনা । ফতোয়া আলমগীরীতে আছে-
يَكُوْنُ مِنَ الْاَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ اَلْغَنَمِ وَالْاِبِلِ وَالْبَقَرِ- وَيَدْخُلُ فِىْ كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهٗ وَالذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى مَعَهٗ وَالْجَامُوْسُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "কোরবানী তিন জাতীয় পশুর দ্বারা দুরস্ত- (১) ছাগল, (২) উট, (৩) গরু। এই তিন জাতীয় পশুর মধ্যে সমজাতীয় পশুও অর্ন্তভুক্ত। নর এবং মাদী পশুও অন্তর্ভুক্ত। আর মহিষ হলো গরু জাতীয় পশু। (সুতরাং উট, গরু, ছাগল ও মহিষ- সবগুলোর নর ও মাদী দ্বারা কোরবানী করা দুরস্ত-অনুবাদক)।

মহিষের গোস্ত মোটা ও শক্ত হওয়ার কারনে যদি মহল্লাবাসী অপছন্দ করে এবং উক্ত গোস্ত নিতে অস্বীকৃতি জানায়-তাহলে এটা খারাপ কাজ হবে। কেননা, এতে অন্য মোসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- لَا تُحَرِّفُوْا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ **"তোমরা বৈধ জিনিসকে পরিবর্তন করোনা"**। আর যদি এই ধারণা করে গোস্ত না নেয় যে, মহিষ দ্বারা কোরবানী করা নাজায়েয, তাহলে এটা হবে জঘন্য অজ্ঞতার কাজ। তাদেরকে শরিয়তের প্রকৃত শিক্ষা সর্ম্পকে অবগত করতে হবে।

বলদ দ্বারা লোকেরা এই খেয়ালে কোরবানী করে না যে, বলদ গাভীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী মূল্যবান পশু। অপর দিকে গাভীর গোস্ত বলদের গোস্তের চেয়ে বেশি উত্তম। এই কারনেই শরিয়তের দৃষ্টিতে বলদের চেয়ে গাভী দ্বারা কোরবানী করাই উত্তম-যদি উভয়ের সমমূল্য হয়। যেমন, ফতোয়া আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

اَلْاُنْثٰى مِنَ الْبَقَرِ اَفْضَلُ مِنَ الذَّكَرِ اِذَا اِسْتَوَايَا لِاَنَّ لَحْمَ الْاُنْثٰى اَطْيَبُ۔ كَذَا فِىْ فَتَاوٰى قَاضِى خَانْ۔

অর্থাৎ "মাদী গরু নর গরুর চেয়ে উত্তম- যদি উভয়ের মূল্য সমান সমান হয়। কেননা, গাভীর গোস্ত বেশী সুস্বাদু"। কাজীখান ফতোয়ায় এরূপই বর্ণনা করা হয়েছে (আলমগীরী)।

ছাওয়াল- ৬৭ ঃ কোন ব্যক্তির আক্বিদা যদি এরূপ হয় যে- মুহররম উপলক্ষ্যে তাজিয়া বানানো সুন্নাত। অথবা সে যদি কোরআনের কোন আয়াত অথবা কোন হাদীস দ্বারা এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করে- তাহলে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের মতে কি সে ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করতে হবে? তার উপর কুফরীর ফতোয়া বর্তাবে কিনা? এই তাজিয়া কিভাবে শুরু হলো? এই তাজিয়া যদি সামনে পড়ে যায়- তাহলে কি উহা সম্মানের

দৃষ্টিতে দেখতে হবে- নাকি হীনদৃষ্টিতে?

জওয়াব ঃ তাজিয়া সম্পর্কে ঐ ধরনের (সুন্নাত) মন্তব্যকারী ব্যক্তিকে নিরেট জাহেল ও অপরাধী বলতে হবে। কিন্তু কাফের বলা যাবেনা। তাজিয়া আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তার দিকে দৃষ্টিপাত না করাই উচিৎ। শুনা যায়, হিন্দুস্তানে তাজিয়ার প্রচলন হয়েছে দিল্লীর বাদশাহ্ আমির তৈমুরের সময় থেকে।

ছাওয়াল-৬৮ ঃ হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহজাদী হযরত ছাকিনা রাদিয়াল্লাহু আনহার শাদী মোবারক মাছআব ইবনে যোবাইরের (রাঃ) পর আর কার কার সাথে হয়েছিল?

জওয়াব ঃ মাছআব ইবনে যোবাইর (রাঃ)-এর পর আরও কয়েকজনের সাথে বিবাহ হয়েছিল-যার বিস্তারিত বিবরন "নূরুল আবছার" ও অন্যান্য জীবন চরিত উল্লেখ রয়েছে।

ছাওয়াল-৬৯ ঃ মসনবী শরীফে কি এমন কোন কবিতাংশ আছে- যার দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ছরওয়ায়ে কায়েনাত হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ মোবারক তিনদিন পর্যন্ত বিনা গোসলে ও বিনা কাফনে ফেলে রাখা হয়েছিল? যে ব্যক্তি এ ধরনের কথায় বিশ্বাস করে-তাকে কি কাফের মনে করতে হবে-না কি মুসলমান?

জওয়াব ঃ এটা সম্পূর্ন মিথ্যা কথা। মসনবী শরীফে এমন কোন শের নেই। এই অপবিত্র খেয়াল একমাত্র রাফেজি শিয়াদের। এমন ব্যক্তিকে বাতিল ও বদদ্বীন বলতে হবে। কিন্তু কাফের বলা যাবেনা। হ্যাঁ, যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান ও মানকে অপদস্ত করার খেয়ালে একথা বলে থাকে-তাহলে অবশ্যই কাফের ও মুরতাদ বলে গন্য হবে।

ছাওয়াল-৭০ ঃ মহর্রম শরীফে মর্সিয়াখানীতে শরীক হওয়া জায়েয আছে কিনা?

জওয়াব ঃ মর্সিয়াখানীতে যোগদান করা নাজায়েয। কেননা, মার্সিয়াখানীতে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কাজকর্ম হয়ে থাকে।

ছাওয়াল-৭১ ঃ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র দীদার নসীব হবে কি না? আল্লাহ্র দীদারে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কি বলা যাবে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

জওয়াব ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা হচ্ছে- পরকালে আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে আপন দীদার নসীব করবেন। ইহা অস্বীকারকারী ব্যক্তি গোমরাহ্, বদ্‌দ্বীন বা বাতিল ফের্কা।

ছাওয়াল-৭২ ঃ মনে করুন- যায়েদ নামক এক ব্যক্তি মোক্তাদী এবং বকর নামক অপর ব্যক্তি ইমাম। তারা উভয়ে মাগরীবের নামায জামাআতে আদায় করার সময় দুই রাকআত পর তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে ইমাম আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে গেলো-কিন্তু মোক্তাদী যায়েদ এখনও পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সারতে পারেননি। এমতাবস্থায় মোক্তাদী কি পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পড়ে উঠবে- না কি ইমামের সাথেই দাঁড়িয়ে যাবে? যদি আত্তাহিয়্যাতু পূর্ণ করে বিলম্বে উঠে-তাহলে তাকে ইমামের অনুসারী বলে গন্য করা হবে কিনা? এর জন্য তার কোন শাস্তি হবে কি না? এভাবে আদায়কৃত নামায হবে কি না?

জওয়াব ঃ উপরে বর্ণিত ছুরতে পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পড়েই দাঁড়ানো মোক্তাদীর উপর ওয়াজিব। ইহাই ইমামের অনুসরন বলে গন্য হবে। আর যদি আত্তাহিয়্যাতু পূর্ণ না পড়েই ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে যায়-তাহলে গুনাহ্‌গার হবে এবং নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইহা ইমামের অনুসরণ বলে গন্য হবে না। কেননা, ইমাম পড়েছে পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু, আর মোক্তাদী পড়লো অসম্পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু। ইহা অনুসরন হলো কি করে?

এখানে মনে একটি সংশয় জাগতে পারে- কিয়াম বা দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তো বিলম্ব হলো- ইহা ইমামের অনুসরণ হলো কি করে? উত্তর হলো এই- বিলম্ব হলেও ইমামের অনুসরন হয়। যেমন- ইমামের কোন কাজের শেষের দিকে মোক্তাদী শরিক হলেও তা ইমামের ঐ কাজের পূর্ণ অনুসরণ বলে গণ্য হবে। (রুকু, সিজদা-ইত্যাদিতে মোক্তাদী শেষের দিকে শামিল হলেও ইমামের পূর্ণ অনুসরন বলে গন্য হবে- অনুবাদক)

এমন কি-কোন ব্যক্তি যদি আত্তাহিয়্যাতু -এর মধ্যে এসে নামাযে শরিক হয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে লাগলো-এমন সময় ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় উক্ত মুসল্লীর উপর ওয়াজিব হলো-পূর্ন আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাঁড়াবে- যদিও বা ইমাম সাহেব এসময়ের মধ্যে আবার রুকুতেও চলে যান না কেন। তখন মুসল্লী আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে দাঁড়িয়ে এক তাসবীহ্ পরিমান দাঁড়িয়ে রুকুতে ইমাম সাহেবের

সাথে শামিল হবে। রুকুতে না পেলে নিজে নিজে রুকু করে সিজদাতে শামিল হবে। সিজদাতেও না পেলে নিজে নিজে সিজদা করে আত্তাহিয়্যাতু -এর মধ্যে শামিল হবেন। মোটকথা-সালামের পূর্বে শামিল হলেই ইমামের অনুসরন হয়ে যাবে-যদিও ইমামের পরেই হোক না কেন। (বিষয়টি খুবই সুক্ষ ও গবেষণামূলক- অনুবাদক)

ছাওয়াল-৭৩ ঃ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তি রাত্রের নিদ্রা হতে এমন সংকীর্ন সময় থাকতে সজাগ হলো যে- এ সময়ে শুধু ওযু করে কোন রকমে ফজর নামায আদায় করা সম্ভব-অথচ তার উপর গোসল ফরয। এমতাবস্থায় কি গোসল করে কাযা নামায পড়বে- নাকি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে তারপর নামাযের অজু করে নামায আদায় করতে হবে? তারপর ফরয গোসল করে সূর্যোদয়ের পর পুনরায় ফজর নামায আদায় করতে হবে কিনা?

জওয়াব ঃ সময় খুব সংকীর্ণ হলে নাপাক অবস্থায়ই প্রথমে তায়াম্মুম ও অযু করে সময় মত ফজর নামায আদায় করে নিতে হবে। পরে ফরয গোসল সেরে সূর্যোদয়ের পর পুনরায় কাযা পড়তে হবে। ইহার উপরেই ফতোয়া।

ছাওয়াল-৭৪ ঃ চান্দ্রমাস সমূহ কখনও বসন্তে,কখনও বর্ষায় এবং কখনও শীতকালে পরিবর্তন হতে থাকে- কিন্তু হিন্দী মাস সবসময় একই মৌসুমে হয় কেন?

জওয়াব ঃ আল্লাহ্ তায়ালার মহান কৌশলে সূর্যের গতির উপরেই মৌসুমের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন, বুরজে হামলের পরিবর্তন থেকে বুরজে জোষা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় বসন্তকাল। তারপর বুরজে ছিরতানের পরিবর্তন থেকে বুরজে ছুমবুলার শেষ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় গরম বা গ্রীষ্মকাল। তারপর বুরজে মিজানের পরিবর্তন থেকে বুরজে কাউছের শেষ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় শরৎকাল। তারপর বুরজে জুদ্দির পরিবর্তন থেকে বুরজে হুত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় শীতকাল। এভাবে সূর্যের একটি ঘুর্ণনকাল ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় পূর্ণ হয়। (বাংলায় বলা হয় ছয় ঋতু)। কিন্তু আরবী মাস হলো চাঁদ ভিত্তিক। চাঁদের প্রথম তারিখ হতে চন্দ্রমাস শুরু হয় এবং ২৯ অথবা ৩০ দিনে পূর্ন একমাস হয়। এটা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৌসুম ভিত্তিক নয়। এতে করে চান্দ্র বৎসর হয় ৩৫৫ দিনে এবং সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিনে। ভগ্নাংশ এতে ধরা হয়নি। চন্দ্র ও সৌর বৎসরের মধ্যে ব্যবধান হয় ১০দিনের। চন্দ্রবর্ষ প্রতি বৎসরেই সৌরবর্ষ হতে ১০ দিন কমে যায়।

এখন মনে করুন- কোন এক সৌরবর্ষের ১লা জানুয়ারী চন্দ্রবর্ষের রমযানের ১লা তারিখ হলে বৎসর শেষে দেখা যাবে- আগামী ২২শে ডিসেম্বর তারিখে আরেক ১লা রমযান হবে। কেননা, চন্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ হতে ১০ দিন কম- অথচ সৌরবর্ষ শেষ হতে এখনও ১০দিন বাকী। এর পরবর্তী বৎসরে রমযান শুরু হবে ১২ ডিসেম্বর। এর পরের বৎসর রমযান শুরু হবে ১লা ডিসেম্বর। এভাবে প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর ১ মাস করে কমতে থাকবে। এমনিভাবে রমযানুল মোবারক পূনঃ ১লা জানুয়ারীতে আসতে ৩৩ বৎসর সময় লাগবে।

অনুরূপভাবে হিন্দি মাসের অবস্থাও চন্দ্র মাসের ন্যায়ই হতো- যদি তারা দিন বৃদ্ধি না করতো। হিন্দু জোতিষীরা বৎসর ধরেছে সৌরবর্ষ হিসেবে -আর মাস ধরেছে চন্দ্রবর্ষ হিসেবে। এতে প্রত্যেক বছর ১০ দিন করে কমতে কমতে তিন বৎসরে ১ মাস কমে যায়। তাই জোতিষীরা উক্ত ঘাটতি পূরনের উদ্দেশ্যে গড়ে তিন বৎসরে একমাস বাড়িয়ে নেয়-যাতে সৌর বর্ষের সাথে সামাঞ্জস্য রক্ষা পায়। তা না হলে হিন্দি জ্যৈষ্ঠ মাস কখনো হতো শীতকালে এবং পৌষ মাস হতো গ্রীষ্মকালে।

খৃষ্টানদের বৎসর ও মাস উভয়টিই সৌর হিসাবে গননা করা হয়। তারাও বৎসরে ৬ ঘন্টা বড়িয়ে প্রতি ৪ বৎসর পর ১ দিন বাড়িয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসকে ২৯ দিনে ধার্য্য করে এবং ঐ বৎসর ৩৬৬ দিনে ১ বৎসর হয়। তা না হলে দেখা যোতো যে, জুনমাস কখনো হতো শীতকালে এবং ডিসেম্বর হতো গ্রীষ্মকালে।

তারা যদি এরূপ না করতো- তাহলে দেখা যেতো-প্রতি বৎসর প্রায় পৌনে ৬ ঘন্টা করে কমতে কমতে ১০০ বৎসর পর ২৫ দিন কমে-যেতো। ফলে প্রথমে যে জুন মাস হতো গ্রীষ্মকালে-তা ৫০০/৬০০ বৎসর পর এসে যেতো শীতের মৌসুমে। অনুরূপভাবে যে ডিসেম্বর মাস হতো শীতকালে, সে ডিসেম্বরই এসে যেতো গ্রীষ্মকালে। কিন্তু একটি সমস্যা হলো-প্রতি বৎসর ৬ ঘন্টা ধরে ৪ বৎসরে ২৪ ঘন্টা

বৃদ্ধি করা হয়। মূলতঃ উহা হবে ২৩ ঘন্টা। তাই ১০০ বৎসর পর পুনরায় ১ দিন কমাতে হয় এবং শতবর্ষের মাথায় সেখানে ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে হবে। এটা তাদের গোঁজামিল।

[এভাবে ইংরেজী ও হিন্দি মাস সৌরবর্ষ হিসাবে গণনা করায় ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম মানা হয় না-বরং নিজেদের আবিষ্কৃত গোঁজামিল দিয়ে বৎসর ও মাস নিজেদেরই নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু চন্দ্রমাস ও চন্দ্রবর্ষ প্রাকৃতিক নিয়মেই আবর্তিত হয়-কারো ধার্য্য করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এ কারণেই হিন্দী মাস একই সময়ে থেকে যায়- আর চন্দ্রমাস ১০ দিন করে কমে যায়- এটা মূল প্রাকৃতিক নিয়ম- অনুবাদক]

ছাওয়াল-৭৫ ঃ শরিয়তের বিধানমতে মহিলাদের স্বর্ণের অলংকার পরিধান করা জায়েয কি না?

জওয়াব ঃ মহিলাদের জন্য সোনা চান্দির গহনা পরিধান করা উত্তম। রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ اُمَّتِىْ وَحَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِهَا۔

অর্থ ঃ "আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করা হালাল এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম"।

[বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) এবং সংকলক হলেন আবু বকর ইবনে শাইবা। তাবরানী মোজামে কবীর দুই সুত্রে উহা বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ (১) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ও (২) হযরত ওয়াসেলা (রাঃ)]।

মহিলাদের জন্য গহনা পরিধান করা এবং রূপচর্চা করা শুধু জায়েযই নয়-বরং এর জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম পুরস্কারও প্রাপ্ত হবেন। গহনা পরিধান করা ও রূপচর্চা করা তাদের জন্য নফল নামায হতেও উত্তম।

বর্ণিত আছে- কোন এক নেককার মহিলা ও তার স্বামী উভয়েই ছিলেন অলী-আল্লাহ্‌। উক্ত মহিলা প্রতিরাত্রেই বাদ নামাযে এশা সাজগোজ করে নববধূর বেশে স্বামীর নিকট আসতেন। যদি স্বামীকে তার প্রতি আকৃষ্ট দেখতেন- তখনই সাড়া দিতেন। তা না হলে অলংকার ও পোষাক খুলে নামাযের মোছল্লা বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

নববধূকে সাজানো তো পুরানো সুন্নাত এবং অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অবিবাহিতা কুমারী মেয়েকেও জিনিসপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখা সুন্নাত- যাতে শীঘ্র বিবাহের প্রস্তাব আসে। এ প্রসঙ্গে রাসুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-
لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ-

অর্থঃ "যদি যায়েদের পুত্র উছামা মেয়ে হতো- তাহলে আমি তাকে অলংকার পরাতাম"। (আহমদ, ইবনে মাযা)

সামর্থবান মহিলাদের জন্য গহনা বিহীন থাকা মাকরূহ। কেননা, ইহা পুরুষদের সাথে সামঞ্জস্যপর্ণ এবং আকর্ষণহীন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে-
كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ تَعَطُّرَ النِّسَاءِ وَتَشَبُّهَهُنَّ بِالرِّجَالِ-

অর্থ ঃ "রাছুল করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা এবং পুরুষলোকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন পোষাক পরিধান করা নাপছন্দ করতেন"।

হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন- يَاعَلِيُّ مُرْ لِنِسَائِكَ لَاتُصَلِّيْنَ عُطَّلًا-

অর্থ ঃ "হে আলী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও-তারা যেন গহনা বিহীন অবস্থায় নামায না পড়ে।" (ইবনে কাছির-আন নেহায়া)।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্হা মহিলাদের বেলায় গহনা বিহীন অবস্থায় নামায পড়া অপছন্দ করতেন এবং বলতেন-**"যদি তারা আর কিছু না পায়, তাহলে অন্ততঃ একগাছি তাগা হলেও যেন গলায় পরিধান করে নেয়"।**

মাজমাউল বিহারে উক্ত হাদীসখানা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَرِهَتْ اَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عُطَّلًا وَلَوْ اَنْ تُعَلِّقَ فِيْ عُنُقِهَا-

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাদের ক্ষেত্রে গহনা বিহীন অবস্থায় খালী গলায় নামায পড়া অপছন্দ করতেন,আর বলতেন-"তারা অন্ততঃ গলায় যেন একটি তাগা হলেও বেধে নেয়" (মাজমাউল বিহার)।

আর ঝনঝনানী বা ঝঙ্কার শব্দধারী গহনা (কাচেঁর) মহিলাদের জন্য ঐ অবস্থায় জায়েয- যদি ঐ ধরনের গহনা পরিধান করে নামুহরিম বা পর পুরুষের নিকট না যায় এবং ঐ গহনার আওয়াজ যেন তাদের কানে না পৌঁছে। যেমন খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, ভাসুর, দেবর, ননদের স্বামী, ভগ্নিপতি। [নামুহরিম অর্থ- যাদের সাথে বিবাহ জায়েয]। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা ছুরা নূর-এ এরশাদ করেন- وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ-

অর্থ ঃ "মহিলারা যেন আপন সাজসজ্জা নিজ স্বামী এবং মুহরিম ব্যতিত অন্যের সামনে প্রকাশ না করেন।" (সুরা নূর)।

আরও এরশাদ হয়েছে-
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ-

অর্থ ঃ "মহিলারা যেন এমনভাবে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য ও সজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে" (সুরা নূর)।

ছাওয়াল-৭৬ ঃ কলেরা রোগ দূর করনার্থে তদবীর হিসাবে আযান দেওয়া দুরস্ত কি না?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, দুরস্ত আছে। আমি অধম (ইমাম আহমদ রেযা) এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছি এবং নাম রেখেছি "নাছিমুছ ছোবা ফী-আন্নাল আযান-ইউহাউভিলুল ওয়াবা"।

ছাওয়াল-৭৭ ঃ বৃষ্টির জন্য আযান দেওয়া দুরস্ত আছে কিনা?

জওয়াব ঃ হাঁ, দুরস্ত আছে। শরিয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আযান হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির এবং বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র রহমত। আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমেই আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। (বৃষ্টির জন্য সুন্নাত তরিকা হচ্ছে ইসতিসকার নামায পড়া-জলিল)।

ছাওয়াল-৭৮ ঃ হাতীর উপর আরোহী অবস্থায় হাতী যদি তার শুড় উঁচু করে খেলা করে, আর নাক বা শুঁড় দিয়ে পানি ছিটকায়-আর ঐ পানি আরোহীর কাপড়ে পড়ে, তাহলে কাপড় পাক থাকবে-নাকি নাপাক হবে?

জওয়াব ঃ এক টাকার মুদ্রার চেয়ে বেশী পরিমান কাপড়ে হাতীর শুঁড়ের ছিটানো পানি লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে।

ছাওয়াল-৭৯ ঃ হাতীর উপর সাওয়ার হওয়া জায়েয কিনা? যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাজায়েয হয়, তাহলে মাকরূহে তাহরীমী হবে- নাকি সরাসরি হারাম?

জওয়াব ঃ হাতীর উপর আরোহন করা মাকরূহ্ (মাহুত ব্যতিত অন্য কেউ- অনুবাদক)। ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে হাতি এরূপ হারাম- যেরূপ শুকর হারাম। উভয় প্রাণী একই ধরনের মৌলিক নাপাক। মাকরূহ্ বা হারাম যাই হোক-আরোহন পরিহার করা উচিত।

ছাওয়াল-৮০ ঃ অযু করার হাউজ ১০x১০ হাত হওয়ার অর্থ কি? দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান সমান-নাকি মোট আয়তন বা বর্গহাত? গভীরতা কি নির্ধারিত আছে?

জওয়াব ঃ ১০x১০ হাতের অর্থ-মোট আয়তন ১০০ বর্গ হাত-চাই দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান সমান হোক-অথবা বেশকম। যেমন ধরুন, হাউজের দৈর্ঘ্য -১০ হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত= ১০০ বর্গহাত। অথবা ২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থ= ১০০ বর্গহাত। অথবা ৫০ হাত দৈর্ঘ্য ও ২ হাত প্রস্থ = ১০০ বর্গহাত। মোট কথা-উক্ত হাউজটির মোট আয়তন হতে হবে ১০০ বর্গহাত, আর হাউজের গভীরতা এতটুকু হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, পানি হাতে নিতে গেলে নীচের তলা যেন দেখা না যায়।

ছাওয়াল-৮১ ঃ মদিনা মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীর উস্তুনে হান্নানা বা রোদনকারী মৃত খেজুর শাখা-যার মধ্যে হেলান দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ বৎসর পর্যন্ত জুমার খুতবা দিতেন বা ওয়াজ করতেন। এ সম্পর্কে মসনবী শরীফে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাহঃ) বলেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার জানাযা পড়ে দাফন করেছেন"। এই মন্তব্য সঠিক কি না?

জওয়াব ঃ নামাযে জানাযা পড়ার ঘটনা সঠিক নয়- বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহাকে মিম্বার শরীফের নীচে মাটিতে দাফন করেছেন- একথা সঠিক। (কোলেও নিয়েছিলেন- জলিল)।

ছাওয়াল-৮২ ঃ এক ওয়াজকারী মাওলানা সাহেব ওয়াজ মাহফিলে বলেছেন-একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন-হে জিবরাইল! তুমি ওহী কোথা হতে এবং কিভাবে সংগ্রহ করো? জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন- "একটি পর্দার অন্তরাল থেকে আওয়াজ ভেসে আসে"। তদুত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি বলেছেন- হে জিবরিল, তুমি কি

উক্ত পর্দা সরিয়ে দেখেছো? জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন- "আমার কী সাধ্য আছে উক্ত পর্দা উন্মোচন করার? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি বললেন- হে জিবরাইল! এবার তুমি পর্দা উঠিয়ে দেখো। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাই করলেন। তিনি দেখতে পেলেন-"পর্দার ভিতর রাছুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা আছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ী ও সামনে আয়না। তিনি ওহীর মাধ্যমে বলছেন- "হে জিবরাইল! তুমি আমার বান্দাদেরকে অমুক অমুক হেদায়াত করো।"

প্রশ্ন হলো-ওয়াজকারী মাওলানা সাহেবের এই বয়ান কতটুকু সত্য? আর যদি অসত্য হয়- তাহলে উক্ত ওয়াজকারী ব্যক্তি শরিয়তের কোন্ বিধানের আওতায় পড়েন? বিস্তারিতভাবে উওর দিয়ে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কৃত হোন।

জওযাব ঃ উক্ত বর্ণনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ওয়াজকারী মাওলানা শয়তানের অনুগত। যদি ঘটনার বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করে- তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

ছাওয়াল-৮৩ ঃ এক ব্যক্তি (যায়েদ) হিন্দু সন্নাসীদের ন্যায় নিজেকে খোলামাথা, খালি পা এবং একহাতে মালা রেখে ঐ হাতকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। একজন মুসলমানের সাথে ঐব্যক্তি একহাতে মুসাফাহা করতে হাত বাড়ানোর পর মুসলমান ব্যক্তি বললো- অপর হাতটি দিন। এতে যায়েদ বললো- আমার ঐ হাত হিন্দু।
তার কাছে এক হিন্দু ছেলেকে এনে কেউ বললো- একে আপনার চেলা বানিয়ে নিন। যায়েদ ঐ ছেলেটিকে "ওঁম" বলে নিজের চেলা বানিয়ে নিলো। এ দিকে সে নিজেকে পীরে তরিকত বানিয়ে রেখেছে। সে মুসলমানদেরকে মুরিদ করায় এবং বলে- আমি হাদীসের সনদ নিয়েছি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে। সে স্থানীয় একজন পীরের মুরিদ বলেও দাবী করে। তার এই দ্বিমুখী ও বিচিত্র আচরনে তাকে মুসলমান বলা যাবে কিনা?

জওয়াব ঃ উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী যায়েদের নিজ স্বীকারোক্তি মোতাবেক সে অর্দ্ধ হিন্দু বলে বুঝা যাচ্ছে। ইসলামে তার স্থান নেই। যে নিজের এক অংশ হিন্দু বলে দাবী করে- সে পূর্ণ হিন্দু। তার স্বীকৃতি অনুযায়ী সে কাফের এবং আল্লাহর নিকটও কাফের বলে গণ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। ফছুলে ইমাদী ও ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে- مُسْلِمٌ قَالَ اَنَا مُلْحِدٌ يُكْفَرُ-

অর্থাৎ ঃ "কোন মুসলমান যদি বলে- আমি মুলহিদ, তাহলে সে কাফের।"

"ওঁম" বলে চেলা বানানো তার কুফরীর জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত দলীল। আর দেওবন্দের সনদ দ্বারা পরিচিত হওয়া তার কুফরীর তৃতীয় প্রমান। হাদীসে এসেছে- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয় আচরণ করে, সে তাদের মধ্যেই গন্য।" তার উক্ত তিনটি কুফরীতে পরিস্কার হয়ে গেলো যে, তার হাতে বায়আত হওয়া হারাম। তার কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে পীর বলা বা তাকে পীর ধরা সবই কুফরী।

ছাওয়াল-৮৪ ঃ বকর নামীয় কোন এক ব্যক্তি মারা গেলো। সে পীর-মুরিদী করতো। সে কাদেরিয়া খান্দানের কুতুবুদ্দিন নামের জনৈক পীরের খলিফা এবং চিশতিয়া খান্দানের কাশেম নানুতবীর খলিফা। সে উভয় তরিকার শাজারা আপন মুরিদগণকে দিতো। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

আরো কিছু জানার আছে। আমর নামক এক ব্যক্তি- যার সাক্ষ্য শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য- সে আমাকে বললো যে, কোন এক ব্যক্তি উক্ত দ্বিমূখী পীরকে (বকর) বললো- বেরেলীর উলামাগণ দেওবন্দ পন্থীদেরকে ওহাবী বলেন। একথা শুনেই বকর নামীয় উক্ত ভন্ডপীর রাগান্বিত হয়ে বললো-"যে ব্যক্তি দেওবন্দ পন্থীদেরকে ওহাবী বলে, সে নিজেই ওহাবী"। বকরের খলিফার নিকট থেকে একথা জানা গেল যে, বকর দেওবন্দের ডিগ্রীধারী।

-এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, এমতাবস্থায় মুরিদগণ কি তার বায়আত ছেড়ে দিবে- নাকি বহাল রাখবে? আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সময়ের মধ্যে বরকত দান করুন।

জওয়াব ঃ আল্লাহ্ পাক সোব্হানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদেরকে আপন রহমতের মধ্যে রাখুন।

দেওবন্দ উলামা সম্পর্কে মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের উলামা এবং মুফতীগণের বিস্তারিত ফতোয়া "হুসসামুল হারামাঈন আলা মান-হারিল কুফরী-ওয়াল মাইন" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (১৩২৪

হিজরীতে লিখিত)। তারপরও পুনরায় বর্ণনা করার আদৌ প্রয়োজন আছে কি? উক্ত গ্রন্থে দেওবন্দী আকাবেরীন সম্পর্কে পরিস্কার বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করবে- সেও কাফের হয়ে যাবে।" مَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهِمْ فَقَدْ كَفَرَ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফের সাব্যস্থ হবে" (হোসসামুল হারামাইন)।

তাদেরকে মুসলমান মনে করা,ছাহেবে এরশাদ মনে করা এবং পীর মনে করা-কোনটিই যেখানে দুরস্ত নেই-সেখানে উক্ত বকরের নিকট বায়আত বহাল রাখার প্রশ্ন আসবে কেন? তার হাতে বায়আত হওয়াই দুরস্ত হয়নি। যেখানে বায়আতই শুদ্ধ হয়নি-সেখানে ভঙ্গ করার কথা আসতে পারেনা। হাঁ, এখন কথিত মুরিদের উপর ফরয হয়ে গেছে- তাকে পীর মনে না করা। যদি পীর মনে করে-তাহলে সেও ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তাদের (কাফের) সাথে বন্ধুত্ব করবে- সে তাদের মধ্যেই গণ্য"।

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেছেন- اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ-

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই তোমরাও তাদেরই মত"।

ছাওয়াল-৮৫ ঃ বকরের স্ত্রী হিন্দা এমন মূল্যবান গহনা পরিধান করেন- যার উপর যাকাত দেওয়া ফরয হয়। এই যাকাত কি বকরের উপর ফরয হবে- নাকি তার স্ত্রী হিন্দার উপর?

জওয়াব ঃ যদি হিন্দা বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে অথবা স্বামীর দান হিসাবে ঐ গহনার মালিক হয়ে থাকে- তাহলে স্ত্রীর উপর যাকাত ফরয হবে। আর যদি স্বামী শুধু ব্যবহার করার জন্য তাকে দিয়ে থাকে,তাহলে স্বামীর উপর ফরয হবে। অর্থাৎ-যিনি মালিক- তার উপরই যাকাত ফরয হবে।

ছাওয়াল-৮৬ ঃ স্ত্রী হিন্দা যদি শুধু গহনার মালিক হয়- কিন্তু নগদ টাকা পয়সার মালিক না হয়, তাহলে তার স্বামী যদি এই শর্তে বৎসরান্তে যাকাত প্রদানের জন্য তাকে টাকা দেয় যে, তা দেনমোহর থেকে কর্তন করা হবে, তাহলে এভাবে স্ত্রীকে দেওয়া এবং স্ত্রীর ধার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেওয়া ও যাকাত দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, এভাবে মোহরানার বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে টাকা নেওয়া জায়েয এবং টাকা দেওয়াও জায়েয-বরং সাওয়াবের কাজ।

ছাওয়াল-৮৭ ঃ সামর্থ থাকা সত্বেও যদি উক্ত স্বামী তার স্ত্রী হিন্দাকে টাকা না দেয়, তাহলে শরিয়ত মোতাবেক কোন অপরাধ হবে কিনা? স্বামী নগদ টাকা না দিলে কিছু গহনা বিক্রি করে যাকাত দেওয়া স্ত্রীর উপর ওয়াজীব হবে কিনা?

জওয়াব ঃ যায়েদের উপর স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। টাকা না দিলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। বরং গহনার মালিক স্ত্রীর উপরই যাকাত ফরয-চাই সে গহনা বিক্রি করে দিক- অথবা অন্যখান থেকে ধার করে দিক- অথবা যাকাত বাবদ কিছু গহনাই ফকির মিছকিনকে দিয়ে দিক।

ছাওয়াল-৮৮ ঃ যেসব গহনার মধ্যে পাথর বা রঙ্গিন কাঁচ জাতীয় জিনিস বসানো থাকে-যেমন পত্ত, নাগিনা, জুশান, টিকলী, বুন্ধি, পেহছীন-ইত্যাদি। এ অবস্থায় ঐ গহনার স্বর্ণের ওজন কিভাবে করতে হবে? পাথর, শিশা, কাঁচ-ইত্যাদি খুলতে গেলে গহনা নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গহনার ওজন করতে হলে অন্যান্য পদার্থ খুলে ওজন করতে হবে-নাকি এগুলো সহ ওজন করতে হবে? নাকি অনুমান করে যাকাত দিতে হবে?

জওয়াব ঃ যাকাত ফরয হয় স্বর্ণ ও চান্দির উপর। শিশা, কাঁচ ও পাথরের ওজন জানা থাকলে সেভাবেই হিসাব করে বাদ দিতে হবে। যদি জানা না থাকে, তাহলে অনুমান করে পাথর বা জড়োয়ার ওজন করতে হবে- যাতে এর চেয়ে বেশী না হয়। এটা হলো অনুমানভিত্তিক হিসাব। অন্য একটি নিয়ম হলো- কোন পাত্রে পানি ভর্তি করে পাল্লার একটি কাঁটায় গহনা রেখে পাত্রের পানির মধ্যখানে এমনভাবে রাখবে -যেন কাঁটাটি পানির মধ্যে ডুবে না যায় এবং পাত্রের তলায়ও যেন না লাগে এবং দ্বিতীয় কাঁটাটি পাত্রের বাইরে শুন্যে থাকবে। এখন বাইরের কাঁটায় বাটখারা রাখবে-যাতে উভয় কাটা বরাবর হয়ে যায়। এভাবে ওজন করলে শুধু স্বর্ণ ও চান্দিরই ওজন আসবে। পাথর ইত্যাদির ওজন এতে আসবেনা। এভাবে কয়েকবার করে যদি

ফলাফল বরাবর হয়- তাহলে উহার ভিত্তিতেই হিসাব করে যাকাত দিবে। (এই পন্থাটি দেশীয়- কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা নয়- অনুবাদক)

ছাওয়াল-৮৯ ঃ স্ত্রী হিন্দা স্বামী বকরকে যাকাতের টাকা দিয়ে বললো- আপনি আমার পক্ষ হতে যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দিবেন। স্বামী আবার অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে বললো- আপনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে দিবেন। এমতাবস্থায় হিন্দা নিজ স্বামীকে উকিল বানানো এবং স্বামী কর্তৃক অন্য আর এক ব্যক্তিকে উকিল বানানো জায়েয হবে কিনা এবং এতে যাকাত আদায় হবে কিনা?

জওয়াব ঃ হিন্দা নিজ স্বামীকে উকিল বানানো এবং স্বামী কর্তৃক অন্য একজনকে উকিল বানানো- উভয়ই জায়েয এবং এতে হিন্দার পক্ষে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ছাওয়াল-৯০ ঃ কোন গরীব লোককে যাকাতের টাকা কী পরিমান দেওয়া যেতে পারে? যেমন- যাকাতদাতা গরীবের একদিনের বা দু'দিনের খাদ্যের পরিমান দিতে ইচ্ছুক। এরূপ জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ গরীব লোককে এ পরিমান যাকাত দেওয়া উচিত- যাতে ৫২ তোলা রৌপ্য বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান না হয়। কেননা, ৫২ তোলা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমপরিমান হলো যাকাত দেওয়ার নেছাব। এই পরিমান দিলে গরীব ব্যক্তি ধনী বলে গন্য হয়ে যাবে এবং তার জন্য তখন যাকাত নেওয়া দুরস্ত হবে না। তাই ঐ পরিমানের চেয়ে কিছু কম দিতে হবে।

আর যদি গরীব ব্যক্তির কাছে নেছাবের কম সোনা চান্দি থাকে, তাহলে তাকে যাকাত এই পরিমান দিতে হবে- যাতে সব মিলিয়ে নেছাব পরিমান না হয়। যেমন গরীবের নিকট ১০ তোলা চান্দি আছে, তাহলে তাকে ৪২ তোলার চেয়ে কম মূল্যমান যাকাত দিতে হবে। তবে যদি সে ব্যক্তি এমন ঋণী হয়ে থাকে যে, তাকে ৫২ তোলা রৌপ্য বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ পরিমান যাকাত দিলেও তার ঋণ পরিশোধ হবেনা-তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধ পরিমান দিয়ে আরো ৫২ তোলার কম দেয়া যাবে। যেমন, দশ হাজার টাকা ঋণ থাকলে ১০ হাজার টাকা যাকাত দেয়া যাবে এবং তার উপরে আরো ৫২ তোলার কম পরিমান দেয়া যাবে। (মোদ্দা কথা হলো-যাকাত পেয়ে গরীব

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেন কোনমতেই নেছাবের মালিক হতে না পারে। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে-অনুবাদক)

ছাওয়াল-৯১ ঃ হিন্দুদের মেলায় মুসলমানদের যাওয়া জায়েয কিনা? যেমন-দশোহরা মেলায় গমন করা। হিন্দুদের মেলায় পুরুষগণ গেলে তাদের স্ত্রী কি বিবাহ থেকে খারিজ হয়ে যাবে? ব্যবসায়ী বা দোকানদারদের যাওয়া কি নিষিদ্ধ? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দিয়ে খোদা প্রদত্ত বিনিময়ের অধিকারী হউন।

জওয়াব ঃ হিন্দুদের যে কোন মেলা দেখার উদ্দেশ্যে যাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। আর ঐ মেলা যদি তাদের ধর্মীয় পূজা উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে- যেখানে শিরক ও কুফরী ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়- তাহলে তো এটা শক্ত হারাম ও কবিরা গুনাহ্ হবে। কিন্তু কুফরী বা শির্ক হবেনা- যদি গমনকারী তাদের ঐ সমস্ত শির্ক ও কুফরীমূলক কাজকে মনে প্রানে ঘৃনা করে। আর যদি তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম পছন্দ করে অথবা ঐগুলোকে খুব হালকা মনে করে- তাহলে কাফের হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়ই স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে ইসলাম বহির্ভূত। আর যদি তাদের পূজা অর্চণা অপছন্দ করে, তাহলে হবে ফাছেক বা গুনাহ্গার। এতে বিবাহ নষ্ট হবে না সত্য- কিন্তু ভীষন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কুফরী বিষয়ে আনন্দ করা সরাসরি গোম্রাহী। দলীল দেখুন-

(১) পবিত্র হাদীস শরীফে এসছে-

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيْكًا مَنْ عَمِلَ بِهِ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি অন্য ধর্মের জনসংখ্যা বাড়ায়, সে তাদের মধ্যে গন্য। আর যে ব্যক্তি অন্য জাতির ধর্মীয় আচার-আচরন পছন্দ করে, সে উক্ত কাজে শরীক বলে গন্য হবে"। (মুসনাদ আবু ইয়ালা, আলী ইবনে মা'বাদ কৃত কিতাবুত তাআত ওয়াল মা'ছিয়াত-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত)।

(২) অন্য একটি সূত্রে একই মর্মে বর্ণিত হযরত আনাছ (রাঃ) হতে হযরত আবুযার গিফারী (রাঃ) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রাঃ) কর্তৃক তার "কিতাবুয যায়েদ"-এ সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহ এরূপ বর্ণনা করেছেন- مَنْ سَوَّدَ مَعَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ-

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে যোগ দেয়, সে ঐ জাতির

মধ্যে গন্য হবে"।

(৩) আর উক্ত মেলা যদি ধর্মীয় না হয়ে শুধু আনন্দ ফুর্তির জন্য হয়- যেমন বিভিন্ন খেলা ও তামাশা প্রদর্শন ইত্যাদি-তাহলেও উক্ত মেলা শরিয়ত নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ও বেহায়াপনা থেকে খালি নয়। সুতরাং শরিয়তে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রদর্শনীও নাজায়েয। যেমন-

রদ্দুল মোহতার বা ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে-

كُرِهَ كُلُّ لَهْوٍ وَالْاِطْلَاقُ شَامِلٌ لِّلنَّفْسِ الْفِعْلِ وَاِسْتِمَاعِهِ-

অর্থ ঃ "ফতোয়ায়ে শামীর মধ্যে উল্লেখ আছে- প্রত্যেক খেল-তামাশাই মাকরূহ্ তাহরীম। "খেল-তামাশা" ব্যাপক অর্থবোধক- খেলতামাশা করা এবং তা দেখা ও শুনা- উভয়ই অন্তর্ভুক্ত"। (শামী)

(৪) তাহ্তাভী শরীফের প্রারম্ভেই "হারাম বিদ্যা ও ভেলকিবাজীর বয়ান" প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে-

يَظْهَرُ مِنْ ذٰلِكَ حُرْمَةُ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِمْ لِاَنَّ الْفَرْجَةَ عَلَى الْمُحَرَّمِ حَرَامٌ-

অর্থাৎ ঃ "ভেলকিবাজী ও ভানুমতি প্রদর্শনকারীর কর্মকান্ড হারাম এবং ঐ তামাশা দেখাও হারাম। কেননা, হারাম কাজের খেলা দেখানোও হারাম"।

বিশেষ করে কাফেরদের শয়তানী বাজে কাজকে ভাল মনে করার মধ্যে রয়েছে ঈমানের ক্ষতিকর বিষয়। তাই কোন মুসলমান কাফেরদের উক্ত শয়তানী খেল-তামাশা মজা করে দেখলে নূতন করে মুসলমান হতে হবে এবং বিবাহও দোহ্রাতে হবে।

(৫) "গামযানুল উয়ূন" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

اِتَّفَقَ مَشَايِخُنَا اَنَّ مَنْ رَاٰى اَمْرَ الْكُفَّارِ حَسَنًا فَقَدْ كَفَرَ حَتّٰى قَالُوْا فِىْ رَجُلٍ قَالَ تَرْكُ الْكَلَامِ عِنْدَ اَكْلِ الطَّعَامِ حَسَنٌ مِّنَ الْمَجُوْسِ وَتَرْكُ الْمَضْاجَعَةِ عِنْدَ هُمْ حَالَ الْحَيْضِ حَسَنٌ فَهُوَ كَافِرٌ-

অর্থাৎ ঃ "কোন কাফেরের ধর্মীয় কর্মকান্ডকে ভাল মনে করলে আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগনের ঐক্যমতে সে কাফের হয়ে যাবে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে ইমামগন বলেছেন-"কোন ব্যক্তি যদি বলে- খাওয়ার সময় অগ্নি উপাসকদের ন্যায় কথা না বলা উত্তম এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের ন্যায় হায়েয অবস্থায় স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া থেকে বিরত থাকাও উত্তম- তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে"।

হিন্দু মেলায় ব্যবসায়ীদের যোগদান প্রসঙ্গ ঃ

হিন্দুদের মেলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান ও ব্যবসায়ীর যাওয়া প্রসঙ্গে শরিয়তের বিধান হলো- যদি ঐ মেলা কুফরী ও শিরিক মূলক হয়, তাহলে ব্যবসা করতে যাওয়া হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা, এমতাবস্থায় ঐ স্থানটি পূজা, কুফরী ও শিরিকের আস্তানা বলে গন্য হবে। দলীল সমূহ-

(ক)ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া বা আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ الدُّخُوْلُ فِى الْبِيْعَةِ وَالْكَنِيْسَةِ- وَانَّمَا يُكْرَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِيْنِ-

অর্থাৎ ঃ "মুসলমানদের জন্য পূজামন্ডপে ও গীর্জামন্দিরে প্রবেশ করা এজন্য হারাম যে, উহা শয়তানের আড্ডাখানা"।

(খ) বাহ্‌রুর রায়েক ফিকাহ্ গ্রন্থে পূর্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখ আছে- وَالظَّاهِرُ اَنَّهَا تَحْرِيْمِيَّةٌ لِاَنَّهَا الْمُرَادُ عِنْدَ اِطْلَاقِهِمْ-

অর্থাৎ ঃ "মাকরূহ" শব্দটি যখন সাধারণভাবে বলা হয়-তখন উহা হারাম অর্থেই প্রযোজ্য হয়। সুতরাং তাতারখানিয়া ও আলমগীরীর মতে হিন্দু মন্দিরে ও পূজা মণ্ডপে যাওয়া মাকরূহ হওয়ার অর্থ হবে- "মাকরূহে তাহ্‌রীমী বা হারাম"।

(গ) ফতোয়ায়ে শামী বা রদ্দুল মোহ্‌তারে মন্দিরে প্রবেশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে- فَاِذَا حَرُمَ الدُّخُوْلُ فَالصَّلٰوةُ اَوْلٰى-

অর্থাৎ ঃ "হিন্দু মন্দিরে বা খৃষ্টান গীর্জায় প্রবেশ করা যেখানে হারাম, তাহলে তথায় নামায পড়াও অনিবার্যরূপে হারাম হবে"।

বাকী রইলো- হিন্দু মেলা যদি শুধু খেল তামাশা ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়ে থাকে- যেমন, যাত্রাগান, থিয়েটার, ভোজবাজীর খেলা- ইত্যাদি। আর ব্যবসায়ী নিজে ঐসব খেল তামাশা থেকে দূরে থাকে- এবং ঐগুলোতে শরিক না হয় বা ঐগুলো না দেখে এবং খেল-

তামাশার নিষিদ্ধ দ্রব্যাদিও বিক্রি না করে-তাহলে ঐ মেলায় ব্যবসায়ী হিসাবে যাওয়া যদিও দুরস্ত আছে- তবুও যাওয়া উচিৎ নয়। কেননা, ঐ স্থানটি হলো হিন্দুদের সমাবেশস্থল। সব সময় সমালোচনার কাজ থেকে দূরে থাকাই উত্তম ও মঙ্গলজনক। এজন্যই ওলামাগন বলেছেন -"যদি হিন্দু বা বিজাতীয় মহল্লা পার হয়ে যেতে হয়- তাহলে শীঘ্র শীঘ্র ঐ মহল্লা অতিক্রম করে যেতে হবে"।

(ঘ) গুনিয়া, যাবিল আহ্‌কাম, ফাতহুল মুঈন, তাহ্‌তাভী-প্রভৃতি গ্রন্থে শীঘ্র অতিক্রম করার কারণ হিসাবে উল্লেখ আছে-

هُوَ مَحَلُّ نُزُوْلِ اللَّعْنَةِ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَلَاشَكَّ اَنَّهُ يُكْرَهُ السُّكُوْنُ فِىْ جَمْعٍ يَكُوْنُ كَذٰلِكَ بَلْ وَاَنْ يَمُرَّ فِى الْاَمَانِ-

অর্থাৎ ঃ "হিন্দু মেলা বা সমাবেশের স্থানসমূহ সব সময়ই খোদার গযব নাযিলের স্থান। সুতরাং ঐ ধরনের স্থানে বসবাস করাও হারাম- এতে কোন সন্দেহ নেই। বরং ঐসব স্থান দিয়ে গমন করাও মাকরুহে তাহ্‌রীমী"। এব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আর যদি ঐ মেলায় সেচ্ছায় কোন মুসলমান শরিক হয়, খেলতামাশা দেখে এবং হিন্দুদের হারাম খেলা ধূলার সামগ্রী বিক্রি করে, তাহলে অবশ্যই তা হারাম ও নাজায়েয হবে।

(ঙ) ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

اِذَا اَرَادَ الْمُسْلِمُ اَنْ يَّدْخُلَ دَارَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ وَمَعَهُ فَرَسُهُ وَسِلَاحُهُ وَهُوَلَا يُرِيْدُ بَيْعَهُ مِنْهُمْ لَمْ يُمْنَعْ ذٰلِكَ مِنْهُ-

অর্থাৎ ঃ "কোন মুসলমান যদি বিজাতীয় যুদ্ধরত দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার ইচ্ছা করে এবং তার সাথে যদি তার নিজস্ব ঘোড়া ও অস্ত্র থাকে এবং তাদের নিকট ঐগুলো বিক্রি করার উদ্দেশ্য না থাকে- তাহলে তাকে ঐ দেশে যাওয়া থেকে বারন করা যাবে না"।

(অদ্রুপ হিন্দুদের মেলায়ও যদি নিষিদ্ধ জিনিস বিক্রি করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে যাওয়াতে বাধা নেই)।

হ্যাঁ, হিন্দু বা খৃষ্টানদের মেলায় যাওয়ার একটি বৈধ পন্থা হলো- কোন আলেম যদি দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐসব মেলায় গমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে- তাহলে যাওয়া জায়েয- যদি শক্তি সামর্থ থাকে এবং যাওয়াও উচিত বলে যদি মনে করা হয়।

আর ঐ মেলা যদি হিন্দুদের একান্ত পূজার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের মেলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বারবার তশরিফ নিয়ে যেতেন। মুশরিকরা ঐসব মেলায় শির্কের আহ্বান জানাতো। মক্কার মুশরিকগন বলতো-

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَامَلَكَ۔

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ্, আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরিক নেই বটে, তবে তোমার অধীনস্থ শরিক আছে এবং তুমিই তার মালিক, সে সয়ংসম্পূর্ণ মালিক নয়"।

যখন ঐ নির্বোধ কুরেশরা "লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা" পর্যন্ত বলতো-তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-

وَيْلَكُمْ قَطْ قَطْ۔

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের বিনাশ হোক-এই পর্যন্ত বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ, সামনের দিকে আর অগ্রসর হয়োনা"।

(নোটঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাঃ) হিন্দু মেলায় গমন সর্ম্পকে যেভাবে চুলচেরা আলোচনা করলেন- তা একজন বিজ্ঞ জজকেও হার মানায়- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৯২ ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের নিকট আযান দেয়া জায়েয আছে কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে। এই অধম (ইমাম আহমদ রেযা) এই মাছআলার উপর একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেছি এবং নাম রেখেছি "ঈযানুল আজরি ফী আযানীল ক্বাবরি"। উহা দেখা যেতে পারে।

ছাওয়াল-৯৩ ঃ কোরআন মজিদ সর্বপ্রথম কিভাবে একত্রিত হলো এবং কে একত্রিত করলেন? (কেননা, কোরআন ২৩ বৎসরে খন্ড খন্ড নাযিল হয়েছিল-অনুবাদক)।

জওয়াব ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই কোরআন মজিদের আয়াত ও ছুরা সমূহের ক্রমধারা আল্লাহর নির্দেশে, হযরত জীবরাইলের বর্ণনা মোতাবেক এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ও পরামর্শে সম্পাদিত ও সংরক্ষিত হয়েছিলো। কিন্তু ঐ সময় কোরআন মজিদের আয়াত সমূহ (বিভিন্ন সময় নাযিল হওয়ার কারনে) সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগনের সীনায়, বিভিন্ন কাগজে, পাথরের বোর্ডে, বকরী বা দুম্বার চামড়া ও হাড়ে এবং বিভিন্ন পন্থায় লিখিত ছিলো। (যুদ্ধ-বিগ্রহের কারনে এবং হুযুরের ইনতিকালের কারনে ঐ সময় সবগুলো একত্রিত করা সম্ভব হয়নি)।

১১ হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নবুয়তের ভন্ড দাবীদার মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে শত শত হাফেযুল কোরআন সাহাবী শাহাদাত বরন করেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইলহামপ্রাপ্ত অন্তরে আল্লাহ্ পাক কোরআন একত্র করার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি খলিফাতুর রাসুল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন-"এই যুদ্ধে বহু হাফেযুল কোরআন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এভাবে জিহাদে হাফেযগন শহীদ হতে থাকলে এবং কোরআন মজিদ খন্ড খন্ড অবস্থায় থাকলে কোরআন মজিদের অনেক অংশ হারিয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। আমার পরামর্শ হলো-এইমর্মে নির্দেশ জারী করা হোক-যেন কোরআন মজিদের সব ছুরা একত্রিত করে এক জিলদে সংরক্ষন করা হয়।

খলিফাতুর রাসুল সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁর এই পরামর্শ খুবই পছন্দ করলেন। তিনি সাথে সাথে আনসারী সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (কাতেবে অহী) কে আহ্বায়ক করে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করে এই মহান কাজের নির্দেশ দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। এভাবেই কোরআন মজিদের সব খণ্ড খন্ড অংশ একত্রিত হয়ে গেলো। সূরাগুলো পৃথক পৃথক করে সন্নিবেশিত করা হলো। ঐ জিলদ বা খন্ড খেলাফতে সিদ্দীকী যুগে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হেফাযতে ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট ইহা সংরক্ষিত ছিল। (এভাবে সাড়ে বার বৎসর কেটে গেলো-অনুবাদক)।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাত বরনের সময় যেহেতু কোন খলিফা তখনও নির্বাচিত হননি-তাই তিনি আপন কন্যা ও নবীপত্নী উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট ঐ জিলদ সোপর্দ করে যান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিন্ন কোরাইশী উচ্চারণ সম্বলিত কোরআন সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ হতো। এই বিভিন্ন উচ্চারন ভঙ্গি নবীজী কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো। যেমনঃ কোন বিশেষ্য মারেফা হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ এর পূর্বে আলিফ- লাম ব্যবহার করতো, আবার কেউ কেউ আলিফ-মীম ব্যবহার করতো। (যথাঃ "বাক্বারা" শব্দটি মারেফা হওয়ার সময় কেউ উচ্চারন করতো "আল-বাক্বারা" আবার কেউ উচ্চারন করতো "আম-বাক্বারা" যেমন কুমিল্লায় "রিক্সার" উচ্চারন করা হয় "রিস্কা" হিসাবে এবং "টেক্সীর" উচ্চারন করা হয় "টেস্কী" হিসাবে-জলিল)।

তদুপরি- নাযিল হওয়ার সময় হরফের নুকতা ও হরকত ছিলোনা। ৮৬ হিজরীতে নোকতা ও হরকত সংযোজন করা হয়। সুতরাং পাঠের সময় -يَعْمَلُوْنَ এর স্থলে কেউ কেউ تَعْمَلُوْنَ পড়তো। এ ধরনের বিভিন্ন উচ্চারনভঙ্গি ও বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি নবীজী কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে কোরআন নূতন স্টাইলে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের জন্য উচ্চারনের পূর্ব অভ্যাস পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য ব্যপার ছিলো বিধায়- তাদেরকে বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারন ও প্রকাশভঙ্গি বা বাগধারার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তারা কোরআনের শব্দগুলো নিজ নিজ আঞ্চলিক ভঙ্গিতে উচ্চারন করতো। (এভাবে সাত রকমের উচ্চারন বা ক্বেরাত অনুমোদিত ছিল- অনুবাদক)।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে কারো কারো মনে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিলো যে, তারা যে ধারায় কোরআন তিলাওয়াত করছেন- বোধ হয় ঠিক এভাবেই কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, এ নিয়ে কোন কোন লোকদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। একথা আমিরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) পর্যন্ত পৌছানো হলে তিনি বললেন- এখনই এ অবস্থা? এখনই এতো মতভেদ? ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করা যেতে পারে?

অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও অন্যান্য গন্যমান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যে, হযরত হাফছা (রাঃ)-

এর নিকট সংরক্ষিত সহীফা বা জিলদ আনয়ন করে উহার হুবহু কপি করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরন করা হোক এবং মূল কপি হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠানো হোক। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছা (রাঃ) কপি পাঠিয়ে দিলেন। (উল্লেখ্য হযরত হাফছা (রঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত কোরআন কোরাইশী উচ্চারণ সম্বলিত ছিল- অনুবাদক।)

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), ছায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ)-প্রমুখ সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে কোরআনের কপি করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ) নির্দেশ দিলেন। মক্কা মোয়াযযমা, শাম, ইয়ামন, বাহরাইন, বসরা ও কুফায় সরকারীভাবে অনুমোদিত কপি প্রেরণ করা হলো এবং রাজধানী মদিনা মোনাওয়ারায় এক কপি সংরক্ষণ করা হলো। কোরআনের মূল কপি হযরত হাফছা (রাঃ)-এর কাছে ফেরত দেয়া হলো।

মূল কপি হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক নষ্ট করা কিংবা মাটিতে পুতে ফেলার অপবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। মূল কপিটি উমাইয়া খলিফা মারওয়ান তলব করে ছিড়ে ফেলে ছিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) শুধূ সূরাগুলো তারতীব মত সাজিয়েছিলেন এবং রুকু, মনজিল ইত্যাদি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছিলেন মাত্র। তিনি কপি করার সময় যেই কমিটি গঠন করেছিলেন- তার চেয়ারম্যান ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)। (হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সময়েও তিনিই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এখনও তিনিই চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন- অনুবাদক)।

ঐ মূল কপিটি পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ)-এর ৫ বৎসর খিলাফতকালে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর ৬ মাস খিলাফতকালে, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর ২০ বৎসর রাজত্বকালে হুবহু সংরক্ষিত ছিলো। এজিদের পর মারওয়ানী শাসনকালে ইহা সংগ্রহ করে ছিড়ে ফেলা হয়।

মোদ্দা কথা হলো- মূল কোরআন মজিদ তো পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে এবং রাছুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। বাকী ছিলো সব ছুরা একত্রিত করে এক জিলদ করার কাজ। তাও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সমাধান করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কয়েকটি কপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরন করে ছিলেন- এতে আঞ্চলিক উচ্চারন বন্ধ হয়ে যায়। একাজে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আলী (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এতে করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একক কোরায়শী উচ্চারণে তিলাওয়াত করার ব্যবস্থা করে তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সুদৃঢ় করেছিলেন। একারনে হযরত ওসমানের উপাধী হয় "জামিউল কোরআন"।

উল্লেখ্য যে, মূলতঃ জামিউল কোরআন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

অর্থাৎ ঃ "কোরআন মজিদকে একত্রিত করা ও সহজপাঠ্য করার দায়িত্ব আমার" (সূরা কিয়ামাহ)।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে জামিউল কোরআন হচ্ছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং সর্বশেষ হযরত ওসমান (রাঃ)। তাঁর এই বিশেষ অবদানের কারনেই তাঁকে জামিউল কোরআন উপাধী দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাঃ) ইতকান শরীফে উল্লেখ করেছেন-

كَانَ الْقُرْاٰنُ كُلُّهٗ كُتِبَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لٰكِنْ غَيْرَ مَجْمُوْعٍ فِىْ مَوْضِعٍ وَّاحِدٍ وَّلَا مُرَتَّبَ السُّوَرِ۔

অর্থ ঃ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই সমগ্র কোরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা এক জায়গায় একত্রিত ছিলোনা এবং সূরা সমূহ ক্রমিকানুযায়ী বিন্যস্ত ছিলোনা" (ইতকান)।

আবু দাউদে হযরত আলী (রাঃ) বলেন-

وَاَعْظَمُ النَّاسِ فِى الْمَصَاحِفِ اَجْرًا اَبُوْ بَكْرٍ۔ رَحِمَ اللّٰهُ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ۔ هُوَاَوَّلُ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللّٰهِ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ۔

অর্থ ঃ "হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন-কোরআন মজিদ একত্রিত ও এক জিল্‌দ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পুরস্কারের সবচেয়ে বেশী হক্বদার ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব- যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাব একত্রিত এক জিল্‌দ করেছিলেন" (আবু দাউদ)।

'মাসাহিফ' গ্রন্থে হাসান সনদ সূত্রে আবদে খায়ের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "আমি নিজে হযরত আলীকে এরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি"। (তারপর উপরে উল্লেখিত হাদীসখানা বর্ণনা করেন।)

কি পরিস্থিতিতে হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআন মজিদকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করেছিলেন- তা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهٗ اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِىْ اَهْلَ الشَّامِ فِىْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَةَ وَاَذَرْبِيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ عَنْ اِخْتِلَافِهِمْ فِى الْقِرَائَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَّخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ اِخْتِلَافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ۔

فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ۔ فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زُبَيْرٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ۔ قَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَيْشِيِّيْنَ الثَّلٰثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّهٗ نُزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلٰى حَفْصَةَ فَاَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوْا۔ الخ۔

হাদীসের অনুবাদ নিম্নরূপ-

"ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেন-ইমাম ইবনে শিহাব সূত্রে হযরত আনাছ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস মোহাদ্দিস মুছা (রাঃ) আমাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে বলেছেন। হযরত আনাছ (রাঃ) বলেছেন-

"হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-যিনি আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয়ের জন্য ইরাকী মুসলিম বাহিনীর সাথে সিরিয়াবাসীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন-তিনি আর্মেনিয়া ও আজার বাইজানবাসীদের কোরআন তিলাওয়াতে বিভিন্ন উচ্চারন ও উচ্চারনভঙ্গি শুনে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধশেষে ফিরে এসে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন- "হে আমিরুল মোমেনীন! আপনি উম্মতকে এই মতভেদ থেকে রক্ষা করুন। কেননা, ইয়াহুদ ও নাছারারা তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের পঠনপদ্ধতি ইতিপূর্বেই পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এই উম্মত যাতে অনুরূপ পরিবর্তন করতে না পারে, তার পূর্বেই আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন"। (আরবের বিভিন্ন উচ্চারণ ও পঠনভঙ্গি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে-জলিল)।

হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর নিকট অনারবদের এই ভয়াবহ পঠন পার্থক্যের কথা শুনে হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে কোরআনের মূলকপি সংগ্রহ করে আনলেন এবং একথা বললেন- আমরা উক্ত মূল কপি দেখে আরও অনেক কপি তৈরী করে মূল কপিখানা আপনার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবো। কথামত হযরত হাফছা (রাঃ) মূল কপি পাঠিয়ে দিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হযরত ছায়ীদ ইবনে আ'ছ (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে হারেছ ইবনে হিশাম -প্রমূখ সাহাবীগনের সমন্বয়ে হযরত ওসমান (রাঃ) একটি কমিটি গঠন করলেন।

উক্ত কমিটির কার্যক্রম শুরুর পূর্বে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিলেন এভাবে-

"তোমরা তিন কোরাইশী সদস্য যদি কমিটির চেয়ারম্যান মদিনাবাসী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)-এর সাথে কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করো-তাহলে কোরায়শী ভাষ্যই অনুসরন করবে। কেননা, কোরআন নাযিল হয়েছে মূল কোরায়শী ভাষায়"। (হযরত যায়েদ বিন ছাবেত ছিলেন মদিনাবাসী)।

এভাবে পূর্ণ কোরআন মজিদের কয়েকটি কপি করে মূলকপি হযরত

হাফছা (রাঃ)-এর নিকট ফিরত পাঠিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একএক কপি পাঠিয়ে দিলেন-(শেষ পর্যন্ত হাদীস বুখারী শরীফ)।

দেখুন! বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতম হাদীস বলছে- "আরবে ও আরবের বাইরে কোরআন পঠনের বিভিন্ন রীতির কথা শুনে হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট থেকে কোরআনের মূলকপি তলব করে এনে উক্ত কপি দেখে ৮ কপি তৈরী করে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে তা প্রেরণ করে উচ্চারণের বিভিন্নমূখী পদ্ধতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মূলকপি তিনি হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট পুনরায় ফিরত পাঠিয়ে দেন"।

সুতরাং-এ ব্যপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু এই সরকারী মহান উদ্যোগকে পরবর্তীকালের শিয়ারা রং-চং লাগিয়ে উহাকে হযরত ওসমানের বানানো ও সংকলিত কোরআন বলে অপপ্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

(শিয়ারা ৪০ পারাযুক্ত এক নূতন কোরআন তৈরী করে গোপনে পাঠ করছে এবং তার নাম রেখেছে মাসহাফে ফাতেমী। এতে সূরা আলী, সূরা ফাতেমা, সূরা হাসান, সূরা হোসাইন-ইত্যাদি সংযোজন করেছে- নাউযুবিল্লাহ -অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৯৪ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট কি কোরআন মজিদের কোন খাস কপি রক্ষিত ছিল-যা দেখে অন্যান্য কপি সংশোধন করা হয়েছে?

জওয়াব ঃ না, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কোন খাস কপি ছিলোনা। বরং মূলকপি হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট গচ্ছিত ছিল-যার বর্ণনা ৯৩ নম্বরে দেয়া হয়েছে।

ছাওয়াল-৯৫ ঃ হিন্দার নিকট একশত দশ তোলা ওজনের রূপার অলংকার এবং বার তোলা ছয় মাশা দুই রত্তি ওজনের স্বর্ণের অলংকার রয়েছে। এমতাবস্থায় কি পরিমান? চান্দি ও কি পরিমান সোনার যাকাত আদায় করতে হবে? রূপা ও সোনা-উভয় প্রকার অলংকারের যাকাত চান্দি দ্বারা আদায় করলে আদায় হবে কিনা? যদি দুরস্ত হয়-তাহলে কি পরিমান চান্দি দিতে হবে?

জওয়াব ঃ চান্দি ও সোনার গহনা উভয়টিই নেছাব পরিমনের চেয়ে বেশী (৫২ তোলা + সাড়ে ৭ তোলা) আছে। সুতরাং চান্দি ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সোনার গহনার যাকাত প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা শতকরা আড়াই অংশ চান্দি ও সোনা দিতে পারলে উত্তম। নতুবা চান্দি ও সোনার মূল্য একত্রে ধরে গড়ে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

ছাওয়াল-৯৬ ঃ কানপুরের কোন এক মসজিদের জন্য এক ব্যক্তি চাঁদা তুলেছে। কিন্তু পৌছাতে পারেনি। এখন সে কি করবে? উহা কি অন্য কোন পূন্যকাজে ব্যয় করতে পারবে? যেমন-মসজিদ, মাদ্রাসা-ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে কিনা?

জওয়াব ঃ যাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা হয়েছে-তাদের পরামর্শক্রমে অন্য কোন পূন্যকাজে ব্যয় করা যাবে। তাদের অনুমতি ব্যতিত অন্য কাজে ব্যয় করা যাবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

ছাওয়াল-৯৭ ঃ শিয়াদের তুক্কিয়া বা দুমূখা নীতির মধ্যে কি কি অনিষ্ট রয়েছে?

জওয়াব ঃ শিয়াদের দো-মূখা নীতির ক্ষতিকর দিক বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। রাফেজী শিয়াদের দোমূখা নীতি এবং মোনাফেকী একই জিনিস। আল্লাহ্ পাক দোমূখা নীতি বা মোনাফেকী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

وَاِذَا لَقُوالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ-

অর্থ ঃ "মোনাফেকদের স্বভাব হলো- মুসলমানদের সাথে যখন তাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁরা বলে-আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন শয়তান বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে- আমরা তো তোমাদেরই লোক; আমরা মুসলমানদের সাথে হাসি বিদ্রুপ করে এলাম" (বাক্বারা)।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ كَانَ لَهٗ وَجْهَانِ فِى الْحَيٰوةِ كَانَ لَهٗ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ- بِاِسْنَادِهِمَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দোমুখী মুনাফিক হবে-কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুটি জিহ্বা রাখা হবে"। (হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির

(রাঃ)-এর বাচনিক সূত্রে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস-বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- - تَجِدُوْنَ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ اَكْثَرُهُمْ شَرًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ

অর্থ ঃ "কিয়ামতের দিনে তোমরা আল্লাহর কিছু বান্দাকে দেখতে পাবে-যাদের অধিকাংশই নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে-তারা হচ্ছে দুমুখা নীতি অবলম্বনকারী মুনাফিক"। (বুখারী, মুসলিম, আবিদ দুনিয়া)।

ছাওয়াল-৯৮ ঃ বালা মুসিবত দুর হওয়ার উদ্দেশ্যে যে পশু যবেহ করা হয়-তার চামড়া মাটিতে পুতে রাখা জায়েয কিনা?

জওয়াব ঃ চামড়া মাটিতে পুতে রাখা নাজায়েয। হ্যাঁ, বালা মুসিবত দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে শরিয়ত সাদকা খয়রাত করার নির্দেশ দিয়েছে। চামড়াটি কোন মিসকিনকে দান করে দিতে হবে অথবা সুন্নী গরীব তালেবুল ইলমকে দান করে দিতে হবে। মাটিতে হালাল চামড়া পুতে ফেলা মাল বিনষ্ট করার শামিল-যা হারাম।

ছাওয়াল-৯৯ ঃ ফজর নামাযের মোস্তাহাব সময় কোন্‌টি? যেখানে উদয়-অস্ত পরিস্কার দেখা যায়, সেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের প্রকৃত পরিচয় কী?

জওয়াব ঃ ফজর নামাযের মোস্তাহাব সময় হলো পূর্ণ সময়ের দ্বিতীয়াংশে। যেমন ধরুন-আজকের ফজরের পূর্ণ সময় হলো ১ ঘন্টা ২০ মিনিট অর্থাৎ ৮০ মিনিট। সুতরাং শেষ চল্লিশ মিনিট হবে মোস্তাহাব সময়। তবে উত্তম হলো- প্রতি রাকআতে চল্লিশ বা ষাট আয়াত করে আদায় করার পর যদি কোন কারনে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়-তাহলে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যেন পুনরায় ঐ পরিমান আয়াত পড়া যায়। এতটুকু সময় হাতে নিয়ে ফজর নামায শুরু করা উত্তম। এদিকে লক্ষ্য রেখে যতই দেরী করা হবে-ততই উত্তম। (মোট ১৬০ আয়াত পাঠ ও আনুষঙ্গিক বিষয়সহ আধঘন্টা সময় লাগতে পারে। সুতরাং সূর্যোদয়ের আধঘন্টা পূর্বে ফজর শুরু করা উত্তম-অনুবাদক)।

দ্বিতীয় বিষয় হলো-উদয়স্থল ও অস্তস্থল পরিস্কার দেখা গেলে এবং মধ্যখানে গাছ-পালা বা বিল্ডিং প্রতিবন্ধক না থাকলে উদয় ধরা হবে-যখন সূর্যের প্রথম কিরন দৃষ্টিগোচর হয়। আর অস্ত ধরা হবে-যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূর্যের শেষ কিরন দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ছাওয়াল-১০০ ঃ যোহরের সময় কখন আরম্ভ হয়? মিরেট শহরে কখন থেকে কখন পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে? যোহরের জামাত কয়টায়-হওয়া উচিত? শীত মৌসুম এবং গরম মৌসুম কোন্ মাস থেকে কোন্ মাস পর্যন্ত গননা করা হয়? উভয় মৌসুমে যোহরের মোস্তাহাব সময় কখন?

জওয়াব ঃ সূর্য হেলে পড়লেই যোহরের সময় শুরু হয়। ঘন্টা বা ঘড়ির হিসাবে এক এক এলাকায় যোহরের প্রথম সময় এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, হিন্দুস্তানের কোন কোন শহরে কোন কোন সময় রেলওয়ের ঘড়িতে সাড়ে বারটায়ও যোহরের সময় হয় না। আবার কোন কোন এলাকয় কোন কোন সময় সাড়ে এগারটার পুর্বেই সময় হয়ে যায়। ইহা নির্ভর করে দিনের সমতা ও সময়ের দৈর্ঘের উপর।

গরম মৌসুমে যোহর পুরা সময়ের দ্বিতীয়াংশে এবং শীত মৌসুমে প্রথমাংশে পড়া মোস্তাহাব।

মিরেট অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় দিনের ৫ টার পরেও যোহরের সময় থাকে এবং শীতকালে কোন কোন সময় দিনের পৌনে চারটার পুর্বেই শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃত পক্ষে সময়ের বিভক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন, বুরজে-হামল-এর শুরু হতে বুরজে জোষা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে বসন্তকাল বলা হয়। বুরজে ছিরতান-এর শুরু হতে বুরজে ছুম্বুলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় গ্রীষ্মকাল। বুরজে মীজান-এর শুরু হতে বুরজে কাউছ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় শরতকাল এবং বুরজে জুদি শুরু হয়ে বুরজে হুত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় শীতকাল।

কিন্তু হিন্দুস্তানের মৌসুমের সাথে বিজ্ঞানীদের কালবিভক্তি খাপ খায়না। বাহার নামক ফিকাহ গ্রন্থকার বসন্তকালকে গ্রীষ্মকালের সাথে একিভুত করেছেন এবং এটাই যুক্তিযুক্ত।

সাধারণভাবে সেপ্টেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত সময়কালকে শীত মৌসুম গণ্য করা উচিত এবং এপ্রিল হতে আগষ্ট পর্যন্ত সময়কালকে গ্রীষ্মকাল গণ্য

করা উচিত। (ইহাই সহজ নিয়ম)

ছাওয়াল-১০১ ঃ আছরের মোস্তাহাব সময় কখন? জামাত কখন হওয়া উচিত?

জওয়াব ঃ সবসময়ের জন্য আছরের পূর্ণ সময়ের শেষার্ধে জামাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মেঘাছন্ন দিনে প্রথমার্ধে হওয়া উত্তম।

ছাওয়াল-১০২ ঃ মাগরিবের আযান ও জামাত কখন হওয়া উচিত এবং মাগরিবের সময় কতক্ষন পর্যন্ত থাকে?

জওয়াব ঃ সুর্য অস্তমিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই মাগরিবের সময় হয়। সুর্যাস্ত হলে আযান ও ইফতারে বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। মাগরিবের আযান ও এক্বামত-এর মধ্যখানে কোন শরয়ী বিরতি নেই। ভারতের মিরাট অঞ্চলে শীতকালে মাগরিবের সময় কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত বহাল থাকে এবং গরমকালে সর্বাধিক ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। (বাংলাদেশের সময় আরো কম -অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১০৩ ঃ ইক্বামতের সময় দেখা যায়-কিছু লোক বসা অবস্থায় থাকে এবং কিছু লোক পূর্বেই দাঁড়িয়ে যায়। প্রশ্ন হলো-ইক্বামতের সময় কি সকলের বসে থাকা উচিত-নাকি দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত? যদি বসে থাকে,তাহলে কখন দাঁড়াতে হবে? আর যদি শুরুতেই দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কি ক্ষতি হবে?

জওয়াব ঃ ইক্বামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরূহ। ইযাহ্ নামক ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মুসল্লি যদি ইক্বামতের শুরুতেও মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে বসে যেতে হবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় সে দাঁড়াবে। ঐ সময় ইমাম ও মুসল্লি সবাই দাঁড়াবেন। (ইহাই সুন্নাত। বিস্তারিত দেখুন মম রচিত ফতোয়া ছালাছা-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১০৪ ঃ চার বা তিন রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে যদি ইমাম দু রাকআতের পর তাশহুহুদ পড়ে ভুলক্রমে দরূদ শরীফও শুরু করেছেন-বলে মুসল্লিগণ অনুমান করেন-এমতাবস্থায় মুসল্লিগণ ইমামকে আল্লাহু আকবার বলে উঠার জন্য ইঙ্গিত করতে পারবে কি না?

জওয়াব ঃ যেহেতু তাশহুহুদ চুপে চুপে পড়া হয়, তাই সঠিকভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা কঠিন ব্যাপার। কেননা, হয়তো ইমাম সাহেব তাশহ্হুদ ধীরে সুস্থে পড়ছেন বলে বিলম্ব হচ্ছে। তবে ইমামের নিকটবর্তী কোন মুসল্লি যদি দরূদ পড়ার শব্দ শুনতে পায়, তাহলে "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা" বলার সাথে সাথে সোবহানাল্লাহ বা আল্লাহু আকবার বলে লোকমা দিতে পারবে। কিন্তু যদি ইমাম সাহেব "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদিন" পর্যন্ত পাঠ করে ফেলেন- এমতাবস্থায় লোকমা দেওয়া জায়েয নেই- বরং অপেক্ষা করতে হবে। স্মরণে পড়লে ইমাম সাহেব যদি দাঁড়িয়ে যান ভাল কথা, নতুবা নামায শেষে প্রথম সালাম ফিরার সময় লোকমা দিতে হবে-যাতে ছাহো সিজদা দিতে পারেন। এর পূর্বে লোকমা দিলে মুসল্লির নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইমাম সাহেব যদি তার লোকমা ঐ সময় গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে যান, তাহলে সবার নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। (সুতরাং সালামের পূর্বে লোকমা না দেয়াই উত্তম-অনুবাদক) তাশাহহুদের পর তিন তসবিহ পরিমানের বেশী বসে থাকলে ওয়াজিব তরক হয় এবং এ কারণে ছাহো সিজদা দিতে হয়।

ছাওয়াল-১০৫ ঃ **শরিয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীন এব্যাপারে কি বলেন-যায়েদ নামীয় এক ব্যক্তি বকর নামের অন্য এক ব্যক্তির নিকট ১০ টাকার মুদ্রা কর্জ চাইলো। কিন্তু বকর মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোট দিয়ে কিছু বাট্টা নিল। তারপর যথা সময়ে যায়েদ উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দিল। এই বাট্টা নেয়া জায়েয হবে কি না?**

জওয়াব ঃ কর্জদাতার জন্য-নোটের ক্ষেত্রে বাট্টা নেওয়া সুদ হবে না। কেননা, বাট্টা হতে তো কর্মকারকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। এখন কর্জ গ্রহীতা যায়েদ ইচ্ছা করলে নোট দিয়েও কর্জ আদায় করতে পারবে- অথবা মুদ্রা দিয়েও আদায় করতে পারবে। (বিষয়টি পূর্বদিনের-বর্তমানে সুদ হবে কেননা, বর্তমানের নোটও কারেন্সীর Value সমান- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১০৬ ঃ ইমাম সাহেব যোহর-আছরে প্রথম রাকআতে অথবা দ্বিতীয় রাকআতে ছুরা ফাতিহা পাঠ করার পর ছোট ছোট আয়াত বিশিষ্ট ছুরা শুরু করেছেন। যেমন-ছুরা আর-রহমান প্রথম আয়াত পাঠ করার পর কিয়াম অবস্থায় অথবা তাশাহুদে হঠাৎ করে তার অযু ভেঙ্গে গেলো। এমতাবস্থায় পিছন থেকে একজনকে টেনে এনে ইমাম বানানো হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিনিধি ইমামকে প্রথম ইমাম

সাহেব কিভাবে বলবেন যে, অমুখ আয়াত থেকে তুমি শুরু করো? কেননা, মাগরিব-এশা প্রথম দু রাকআতে ছুরা ক্বিরাত উচ্চস্বরে পড়া হলে বলার প্রয়োজন ছিলনা। তখন খলিফা বা প্রতিনিধি নিজেই বুঝে নিতেন। কিন্তু যোহর-আছরে নিম্নস্বরের ক্বেরাত হওয়ার কারণে কোন্‌খান থেকে শুরু করতে হবে- তা কিভাবে বুঝবেন?

জওয়াব ঃ নামাযের মধ্যে ওযর বশতঃ অন্য কাউকে প্রতিনিধি করার জন্য ১৩টি শর্ত জানতে হবে। সাধারন লোকের পক্ষে এত শর্ত পালন করা কঠিন। নামাযে অযু ভঙ্গ হয়ে গেলে উত্তম হলো-অযু তাজা করে উক্ত ইমামই দ্বিতীয়বার শুরু থেকে নামায পড়াবেন। উত্তম পন্থা ছেড়ে দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে নামায পড়ার প্রয়োজন কি?

যদি প্রতিনিধি ইমাম দিয়েই বাকি নামায আদায় করার একান্ত ইচ্ছা হয় এবং গোলমালের সম্ভাবনা না থাকে-তাহলে দ্বিতীয় ইমাম যে কোন ছুরা বা আয়াত পড়বে। নিম্ন স্বরের ক্বেরাত বিশিষ্ট প্রথম দু রাকআত হলে (যোহর, আছর) ছুরা ফাতেহা থেকেই শুরু করতে হবে এবং শেষের এক বা দুরাকআতে শুধু ছুরা ফাতেহা পাঠ করবে। আর যদি শেষ বৈঠকের তাশাহুহুদে উক্ত ঘটনা ঘটে-তাহলে প্রতিনিধি ইমাম শুধু আত্তাহিয়্যাতু থেকে পাঠ করে নামায শেষ করবেন। (এরকম না করাই উত্তম-অনুবাদক)

ছাওয়াল-১০৭ ঃ **ইমাম রুকু হতে "ছামি আলল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে দাঁড়িয়ে যদি জোরে জোরে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলে ফেলে-তাহলে এরূপ করা দুরস্ত হবে কিনা? ইমাম সাহেবের "ছামি আলল্লাহু লিমান হামিদাহ্" তাকবীর শুনে যদি অন্য সুন্নাত বা নফল আদায়কারী "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলে-তাহলে ঐ ব্যক্তির নামায হবে কি না?**

জওয়াব ঃ ইমাম শুধু "ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবেন। (মোক্তাদীগণ বলবে-"রাব্বানা লাকাল হামদ"-ইহাই সুন্নাত নিয়ম)। ইমাম যদি নিজে "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলে ফেলেন এবং উহা উচ্চ আওয়াজে বলেন-তাহলে উভয় প্রকারই খেলাফে সুন্নাত।

ইমাম সাহেবের 'ছামি আল্লাহু তাকবীরের জওয়াব যদি অন্য নামাযের মুসল্লী দেয়-তাহলে তার নামায বাতিল বলে গন্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-১০৮ ঃ মসজিদের মিহ্‌রাবে ইমামের দুপাশে বিনা প্রয়োজনে কিছু মুক্তাদীর দাঁড়ানো কি শুধু তাদের জন্য মাকরুহ্- নাকি অন্য সব মুক্তাদীর জন্যও মাকরুহ্ হবে?

জওয়াব ঃ বিনা প্রয়োজনে ইমামের সাথে যারা মিহরাবে দাঁড়াবে-শুধু তাদের নামাযই মাকরুহ্ হবে-অন্য মুক্তাদীদের নামায মাকরূহ হবে না। ইমাম সাহেবের উচিৎ-তাদের নিষেধ করা।

দোররে মোখ্‌তারে উল্লেখ রয়েছে-

وَيَنْبَغِيْ (لِلْاِمَامِ) اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِاَنْ يَّتَرَصَّوْا وَلْيَسُدُّوا الْخَلَلَ-الخ-

অর্থাৎ ঃ "ইমামের উচিৎ-মোক্তাদীগণের কাতার সোজা করা ও ফাঁক বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া বুঝা গেলো মোক্তাদীদের কাতার পিছনে হতে হবে।

ছাওয়াল-১০৯ ঃ শুধু ইমামের জন্য মোসল্লার ব্যবস্থা করলে এবং মোক্তাদীগণ বিনা মোসল্লায় নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে কিনা?

জওয়াব ঃ শুধু ইমামের জন্য মোসল্লা বিছানোর ব্যবস্থা করা এবং মোক্তাদীদের জন্য ব্যবস্থা না করা মাকরূহ নয়। ইহাই ইমামের সম্মান। ইমামের সম্মান করা শরিয়াতে নিষিদ্ধ নয়। ফিক্‌হ বা হাদীসে এরূপ করার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

তবে, ইমাম একা উপরে বা উঁচুস্থানে দাঁড়ালে এবং মোক্তাদীগন নিচে দাঁড়ালে নামায মাকরূহ হবে। ইহা ফিকাহতে উল্লেখ আছে-কিন্তু মোসল্লার বিষয়টি তদ্রুপ নয়। কাজেই মাকরূহ হবেনা কারণ, বাহ্‌রুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- اَلْكَرَاهَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيْلٍ خَاصٍّ-

অর্থাৎ ঃ "মাকরূহ্ প্রমাণ করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন হবে"। (বাহ্‌রুর রায়েক)।

মাখ্যুল গাফফার গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

بِمِثْلِ هٰذَا لَاتَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ اِذْلَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيْلٍ خَاصٍّ-

অর্থাৎ ঃ "এরূপ কাজের দ্বারা ইমামের নামায মাকরূহ হবেনা- কারণ মাকরূহ প্রমাণ করার জন্য পৃথক স্পষ্ট দলীল প্রয়োজন" (মাখ্যুল গাফফার)।

তবে ইমাম সাহেব যদি তাকাববুরী বা অহংকার করে নিজের বড়ত্ব

প্রমান করার জন্য নিজে নিজে এভাবে পৃথক সত্ত্বা প্রমান করতে চায়-তাহলে তার এরূপ নিয়ত করা হারাম ও শক্ত কবীরা গুনাহ্ হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এরূপ অহংকার থেকে রক্ষা করুন, কেননা, অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনও ভালোবাসেন না।

ছাওয়াল- ১১০ ঃ শরিয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীন নিম্নবর্নিত মাসআলা সর্ম্পকে কি বলেন?

(১) কোন ব্যক্তি যদি নিজের বসবাসের বাড়ীর অতিরিক্ত আর একটি বাড়ী ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তৈরী করে বা খরিদ করে। এমতাবস্থায় তার উপর কি উক্ত বাড়ী তৈরীর মূলধনের উপর যাকাত ফরয হবে- নাকি শুধু ভাড়ার টাকার উপর?

(২) ঘরের সৌন্দর্যের জন্য তামা, পিতল, ইত্যাদির প্লেট বা বরতন ক্রয় করে ঘর সাজালে এবং ব্যবহার করলে-এগুলোর যাকাত দিতে হবে কিনা?

জওয়াব ঃ (১) ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর বা দোকান ইত্যাদি খরিদ করলে বা তৈরী করলে মূল টাকার উপর যাকাত হবে না-বরং ভাড়ার টাকার উপর যাকাত ধার্য হবে-যদি তা বৎসরান্তে নিজের খরচ বাদে নিসাব পরিমান উদ্বৃত্ত থাকে। (কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি হলেও তার উপর যাকাত হবে না। শুধু ব্যবসার মেশিনারী, কাপড় বা মালের উপর যাকাত ফরয হবে-অনুবাদক)।

(২) ঘরের বরতন ও আসবাবপত্রের উপর যাকাত হয় না-যদিও তা লক্ষ টাকারই হোক না কেন। কেননা, ইহা প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত।

স্মরণযোগ্য, যাকাত শুধু তিন প্রকার সম্পদের উপর ধার্য হয়। যথাঃ-(ক) স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর যাকাত দিতে হবে। উহা মুদ্রা বানিয়ে অথবা পাত বানিয়ে রাখুক, অথবা তা পরিধান করুক অথবা ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে রাখুক, (খ) বিক্রির উদ্দেশ্যে খরিদকৃত জমিন, মাল বা মেশিনপত্রের প্রকৃত মূল্যের উপর। (গ) গৃহ পালিত পশু-যথাঃ গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া-ইত্যাদি- যা পালন করে বিক্রয় করা হয়। এছাড়া অন্য কোন ধরনের সম্পদের উপর যাকাত ফরয নয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

ইরফানে শরিয়ত

২য়খণ্ড

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাঃ)

ছাওয়াল-০১ ঃ উলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এব্যাপারে কি অভিমত পেশ করেন?

জনৈক মুসলমান ব্যক্তি লুঠ্যা নামক ব্যবসায়ীদের কর্মচারী হিসাবে নেপালের বনাঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন। তিনি নেপালের এমন জায়গায় থাকেন- যেখান থেকে ২/৩ মাইল দুরে জনবসতি রয়েছে। সেখানে কৃষিজাত পন্য উৎপন্ন হয়। তার এই কর্মস্থল সরকারের অধীন অনাবাদি ভূমিতে অথবা জঙ্গলের মধ্যে রেল ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত। রেলষ্টেশন থেকে জনবসতি ২/৩ মাইল দুরে। সেখানেও ক্ষেতি ফসল হয়। তার মনিব যখন তাকে উক্ত বিরান ভূমি বা স্টেশন নিকটবর্তী স্থানে কাজে পাঠান- তখন কতদিনের জন্য পাঠাচ্ছেন- তা নির্দ্ধারিত করে দেননি। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামায তো কছর হিসাবেই আদায় করতে হবে। কেননা, প্রথমতঃ দেশটি হিন্দুদের দেশ। দ্বিতীয়তঃ তিনি এমন স্থানে বাস করেন- যেখানে না আছে বসতি, না আছে ক্ষেতিফসল। তৃতীয়তঃ তার হিন্দু মনিব যখন ইচ্ছা তাকে অন্যত্র বদলী করতে পারেন। মোট কথা- হিন্দুদের দেশে হিন্দু মনিবের অধীনে অস্থায়ী জায়গায় তার চাকুরী। অনাবাদী স্থানে তার সরকারী পোষ্টিং।

এমতাবস্থায় কছর পড়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা, মুকিম হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো-যেখানে কর্মচারী অবস্থান করবে-উক্ত জায়গায় বসতি অথবা ক্ষেতি থাকতে হবে। তিনি তো এখন একজন কর্মচারী। ১৫ দিন বা বেশী থাকার ব্যাপারে তিনি স্বাধীন নন। অস্থায়ী অবস্থানে তো নামায কছরই পড়তে হয়।

-এখন প্রশ্ন হলো-যদিও উক্ত কর্মচারী বিরান ও অনাবাদী স্থানে থাকুক না কেন-তার খাদ্য রেশন ইত্যাদিতে তো কোন ব্যাঘাত হচ্ছেনা এবং

তার সাথে অন্যান্য দশ বিশ বা পঞ্চাশজন কর্মচারীও থাকছেন। বন্য হিংস্র পশুর কোন ভয়ও সেখানে নেই। তদুপরি, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থানে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। প্রয়োজনে ছুটিও নিতে পারেন। এ হিসাবে কর্মচারী স্বাধীন। এমতাবস্থায় ঐ চাকুরীজীবি ব্যক্তিকে নামায কছর পড়তে হবে কি কারণে ? সে এখন কাজের ধরণ দেখে বুঝে নিতে পারে যে, সেখানে ১৫ দিন থাকবে-না কম সময়। যদি ১৫ দিনের নিয়ত করে-তাহলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে-নতুবা কছর। মোদ্দা কথা হলো-কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সে কি মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে-নাকি মুকিম হিসাবে? এমতাবস্থায় সে ইমামতি করলে স্থানীয় মুসল্লীগন কি হিসাবে তার পিছনে ইকতিদা করবে? অনুগ্রহ পূর্বক স্বপ্রমান বর্ণনা করুন।

জওয়াব ঃ উক্ত কর্মচারী তিনদিনের সফর করে যাননি- কাজেই কছর পড়া লাগবেনা। তার কছর পড়া না জায়েয হবে এবং পূর্ণ নামায আদায় করাই ফরয। বাহরুর রায়েক ও রদ্দুল মোহতার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- هٰذَا اِنْ سَارَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّالَّا فَلَا وَلَوِ الْمَفَازَةَ -

অর্থাৎ ঃ "তিনদিনের সফর হলেই পথে এবং "সেখানে কছর পড়তে হবে, নতুবা পূর্ণ নামায পড়বে- যদিও ঐ জায়গা আনাবাদীই হোক না কেন"।

সেখানে যে কাজে কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছে- যদি কাজে ১৫ দিনের বেশী সময় লাগে আর দূরত্বও সফরের- এমতাবস্থায় পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী বা হিন্দুদের জায়গা হওয়ার কারণে কছর মাফ হবে না। কেননা, এতে কেউ বাধা দিচ্ছেনা।

দোররে মোখতার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- مَنْ دَخَلَهَا بِاَمَانٍ فَاِنَّهٗ يُتِمُّ -

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি কোনস্থানে নিরাপদে পৌছতে ও (১৫ দিন) থাকতে পারে- সে তথায় পূর্ণ নামায আদায় করবে"।

১৫ দিন অবস্থানের অনিশ্চয়তা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন অনিশ্চয়তা তো সর্বত্রই হতে পারে। চাকরীজীবির বেলায় যদি পূর্ণ নামায পড়তে হয়- তাহলে অন্যান্য স্বাধীন লোকের বেলায় তো কোন প্রশ্নই আসেনা। তাদের বেলায়ও ১৫ দিনের নিয়তের উপর মাসআলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নির্ভরশীল। (ইমাম মুসাফির হলে মুকিম লোকেরা বাকী রাকআত বিনা ক্বেরাতে আদায় করবে-শুধু সূরা ফাতিহা পরিমান দাঁড়িয়ে রুকুতে যাবে- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-০২ ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আন্হা কখন ইনতিকাল করেছিলেন?

জওয়াব ঃ ৫৮ হিজরী ১৭ই রমযান মঙ্গলবার ৬৬ বৎসর বয়সে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আন্হা ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁকে দাফন করা হয়। উক্ত জানাযায় মদিনা মোনাওয়ারার অধিকাংশ বাসিন্দা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর তিন ভাতিজা যথাক্রমে- হযরত কাশেম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) এবং দুই ভাগিনা যথাক্রমে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাঁকে মাযার শরীফে নামান। জানাযার নামাযে ইমামতি করেছিলেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। যারকানী শরীফের বর্ননা অনুযায়ী ৫৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ওয়াকেদীর বর্ননা মতে ৫৮ হিজরী ১৭ রমযান মঙ্গলবারের উল্লেখ আছে। এই মতকেই অধিকাংশ ঐতিহাসিকগন সমর্থন করেছেন এবং ফতোয়া শামীতেও তা-ই উল্লেখ আছে। উয়ুন গ্রন্থেও তিন ভাতিজা ও দুই ভাগিনা এবং হযরত আবু হোরায়রার নাম উল্লেখ আছে।

ছাওয়াল-০৩ ঃ হিন্দুস্থানের কোন একটি মসজিদে জুমার দিনে একটি কাতার বিনা ওজরে এমনভাবে দাঁড়ালো যে, তা ইমাম সাহেবের সামান্য পিছনে- কিন্তু সিজদা পুর্নভাবে ইমামের পিছনে হয় না বরং ইমামের সিজদার জায়গা হতে সামান্য পিছনে দিতে হয়। এব্যাপারে দুইজন আলেম দুই রকমের ফতোয়া দিয়েছেন।

একজন বলেছেন-যদি প্রথম কাতার এভাবে সামান্য পিছনে দাঁড়ায়-তাহলে ইমাম ও সমস্ত মোক্তাদীর নামাযই মাকরুহ তাহরীমী হবে এবং নামায দোহ্রাতে হবে। তার যুক্তি হলো, মোক্তাদী যদি ২ জন হয়-তাহলে ইমামের বরাবর দাঁড়ানো শরীয়তের নির্দেশ। আর যদি ৩ জন বা ততোধিক হয়, তাহলে এক কাতার পিছনে দাঁড়াতে হবে এবং মোক্তাদীগনের সিজদা ইমামের পিছনে হতে হবে।

অন্য আলেম সাহেব বলেছেন-না, প্রথমজনের মাসআলা সঠিক নয়-

বরং জায়গা সঙ্কুলান না হলে প্রথম কাতারের মুসল্লীগন ইমামের সামান্য পিছনে দাঁড়ালেই চলবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযর্গ ব্যক্তিরা এভাবেই পড়েছেন এবং আপত্তি করেননি। আমাদের উচিৎ উনাদের অনুসরণ করা। প্রথম কাতার সম্পূর্ন পিছনে হওয়ার মাসআলাটি এক শ্রেণীর আলেমরা নতুন বানিয়ে নিয়েছে।

-এখন আমাদের জিজ্ঞাসা হলো- কার কথা সঠিক? যদি প্রথম জনের মতামত সঠিক হয়, তাহলে স্থান সংকুলানের ওযরের সময় কি করা যাবে? উদাহরন স্বরূপ-মসজিদ যদি মুসল্লীদ্বারা ভরপুর হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত দুইশত মুসল্লী এসে হাযির হয়-এমতাবস্থায় একশত সত্তর বা একশত আশিজন মুসল্লীকে মসজিদের বাইরে খালী জায়গায় ব্যবস্থা করে বাকী ২০/৩০ জন মুসল্লীকে ইমামের সামান্য পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলে কি নামায শুদ্ধ হবে? আর একটি উদাহরন-মসজিদের ভিতরে আর মাত্র নয়জন মুসল্লী দাঁড়াবার জায়গা খালি আছে। হঠাৎ করে দুইশত লোক এসে গেলো। এমতাবস্থায় নয়জনকে ভিতরে দিয়ে বাকী লোকেরা মসজিদের বাইরে খালী জায়গায় কি দাঁড়াতে পারবে? নাকি-বাইরে জায়গা খালী থাকলে পরে আগত সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে?

জওয়াব ঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় (ইমামের সামান্য পিছনে) ইমাম ও মোক্তাদী সকলের নামাযই মাকরূহে তাহরীমী হবে। নামায পুনরায় দোহ্রায়ে পড়তে হবে। এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থার মাসআলা। ওযরের মাসআলা ভিন্ন।

শরীয়তের বিধান হলো-মুসল্লী একজন হলে ইমামের বরাবর দাঁড়াবে। ইহাই সুন্নাত। যদি নামাযের মধ্যে আর একজন এসে যায়-তখন প্রথম মুসল্লী পিছনে চলে আসবে। যদি সে পিছনে না আসে- অথবা জায়গা না থাকে,তাহলে ইমামের উচিত-এক কাতার বরাবর সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া। ইমাম যদি আগে না বাড়েন-তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ইমামের বরাবর দাঁড়িয়ে যাবেন। ইহাই উত্তমপন্থা। আর যদি তৃতীয় আর একজন মুসল্লী এসে প্রথম ২ জনের মত ইমামের বরাবর দাঁড়িয়ে যান- তাহলে সকলের নামায মাকরুহ তাহরীমী হয়ে যাবে। কেননা, মুসল্লী তিন হলে ইমামের সামনে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব ছিল। ওয়াজিব তরক করলে মাকরূহে তাহরীমী হয়। এব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুররে মোখতারের মন্তব্য হলো-

وَالزَّائِدُ يَقِفُ خَلْفَهُ فَلَوْ تَوَسَّطَ اِثْنَيْنِ كُرِهَ تَنْزِيْهًا - وَتَحْرِيْمًا لَوْ اَكْثَرَ -

অর্থাৎ ঃ "মুসল্লী দুয়ের বেশী হলে ইমামের সম্পূর্ণ পিছনে দাঁড়াবে। দুজনের বেশী হলে ইমামের বরাবর দাঁড়ালে মাকরূহে তাহরীমী হবে"।

ফতোয়ায়ে শামী বা রদ্দুল মোহাতারের মন্তব্য হলো-

اَفَادَ اَنَّ تَقَدُّمَ الْاِمَامِ اَمَامَ الصَّفِّ وَاجِبٌ كَمَا اَفَادَهُ فِى الْهِدَايَةِ وَالْفَتْحِ

অর্থাৎ ঃ "দুররে মোখতারের উপরোক্ত ইশারা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, তিন বা ততোধিক মুসল্লী হলে ইমামকে সামনে চলে যাওয়া ওয়াজিব। তিনি ওয়াজিব তরক করলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হয়ে যাবে। হেদায়া ও ফত্হুল ক্বাদীর গ্রন্থেও অনুরূপ মতামত উল্লেখ করা হয়েছে"।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্থান সঙ্কুলান না হলে বা মুসল্লী বেশী সমাগম হয়ে গেলে এবং মসজিদে জায়গা না হলে কিছু মুসল্লী ইমামের বরাবর বা সামান্য পিছনে দাঁড়ানো ওযর বশতঃ জায়েয হবে। ওযর না থাকলে বাকী লোকদের নামায হবেনা। অনুরূপভাবে ওযর বশতঃ মসজিদের দরজায়ও লোক দাঁড়াতে পারবে- যদি বাইরে দাঁড়াবার জায়গা মোটেই না থাকে- অথবা বৃষ্টির দরূন বা প্রখর রৌদ্রের কারণে যদি বাইরে দাঁড়ানো সম্ভব না হয়। (খাযানা, গুন্ইয়া, কেফায়া, দোররে মোখতার)।

ছাওয়াল-০৪ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফখরে আলম বা ফখরে জাহান বলা যাবে কি না?

জওয়াব ঃ ফখরে আলম বা ফখরে জাহান বলা যথাযথ নয়-বরং শাহে জাহান বলা যেতে পারে।

ছাওয়াল-০৫ ঃ নিম্নে বর্ণিত কবিতা পংক্তির মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে?

"মোস্তফা কি নাখোদায়ী ছে রেহায়ী মিলগেয়ী
ওয়ারনা বেড়া নুহ্ কা মানজেধার মে গারকে আব্ থা"।

অর্থাৎ ঃ "মোস্তফা (দঃ)-এর কাণ্ডারীত্বের দ্বারাই কিস্তির নাজাত প্রাপ্তি হয়েছিল। নতুবা নূহ (আঃ)-এর কিস্তি পানির ঢেউয়ের আঘাতেই ডুবে যেতো"।

জওয়াব ঃ উক্ত কবিতাংশের প্রথম লাইনটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, উহার প্রথম লাইনের অন্য রকম অর্থও হতে পারে। যেমন- "মোস্তফা (দঃ)-এর কান্ডারিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া গেল"। সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক অর্থের কারণে প্রথম লাইনটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় লাইনটিও ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে, নূহ নবীর কিস্তি ঐ পানিতে ডুবে গেলে তা হতো গযবে পতিত হওয়া। ঐ বন্যার পানি ছিল গযবের পানি। নবীগণ সর্বদা খোদায়ী গযব হতে মুক্ত। সুতরাং পূর্ণ লাইন দুইটিই আকায়েদের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ। (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর কাব্য জ্ঞান খুবই নিখুত-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-০৬ ঃ একটি কবিতায় হযরত গাউসে পাকের চেহারা দর্শনের আকুতি জানিয়ে জনৈক কবি বলেছেন- "হে শাহে জিলান! আপনি আমাকে আপনার "মুখড়া" বা চেহারা দেখান"। এই পংতির মধ্যে"মুখড়া" শব্দটির ব্যবহার ঠিক হয়েছে কিনা?

জওয়াব ঃ উর্দু ভাষায় "মুখ" অর্থ পূর্ণ চেহারা আর "মুখড়া" অর্থ আংশিক বা ছোট চেহারা। তাই বুর্যুর্গানের শানে 'মুখড়া'শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত।

ছাওয়াল-০৭ ঃ جن کی ہر چیز کی مولی نے قسم کھائی۔

অর্থঃ "যাঁর (নবীর) প্রত্যেক বস্তুর কছম খেয়েছেন স্বয়ং মাওলা"এরূপ বলা শুদ্ধ কিনা?

জওয়াব ঃ "কছম খাওয়া" এরূপ বলা আল্লাহর শানের খেলাফ। কেননা, "খাওয়া" হতে আল্লাহ মুক্ত। সুতরাং এরূপ বলা শুদ্ধ নয়-বরং "মাওলা" এর স্থলে "কোরআন" বললে শুদ্ধ হবে। তখন অর্থ হবে-"নবী করিম (দঃ) এর প্রত্যেক বস্তুর কছম খেয়েছে কোরআন"।

ছাওয়াল-০৮ ঃ সাধারন গোসলের সময় নিয়ত করতে হবে কিনা? নিয়ত করা লাগলে কিরূপে করতে হবে? স্ত্রীমিলনের পর গোসলের নিয়ত কিরূপে এবং স্বপ্নদোষের পর কিরূপে নিয়ত করতে হবে? যদি স্ত্রীসহবাস ও স্বপ্ন দোষের গোসলে নিয়ত না করা হয়-তাহলে কি হবে?

জওয়াব ঃ ফরয গোসলে নিয়ত করা সুন্নাত আর সাধারন গোসলের নিয়ত নেই। কিন্তু তৈয়ম্মুমে নিয়ত করা ফরয। অযু বা ফরয গোসলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি নিয়ত না করে, তাহলে ওযু ও ফরয গোসল আদায় হয়ে যাবে। (তৈয়ম্মুমে নিয়ত না করলে তৈয়ম্মুম হবে না)। গোসলের সুন্নাত নিয়ত নিম্নরূপে করতে হবে।

"নাওয়াতুল গোসলা লি-রাফ্ইল জানাবাতি ওয়া ইসতিবাহাতাল লিস সালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহি তায়ালা"।

আরবী জানা না থাকলে এভাবে নিয়ত করবে- "আমি নাপাকি দূর করণার্থে এবং নামায জায়েয হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসলের নিয়ত করলাম"।

[তৈয়ম্মুমের নিয়ত ঃ "নাওয়াইতু আন আতা ইয়াম্মামা লি-রাফ্ইল হাদাসি ওয়া ইস্তিবা-হাতাল লিস্ সালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহি তায়ালা"]।

ছাওয়াল-০৯ ঃ কোন ব্যক্তি যদি ফরয গোসলের উদ্দেশ্যে গোসলখানায় প্রবেশ করে এবং অযু করে লুঙ্গি খুলে গোসল করে- তাহলে গোসল শুদ্ধ হবে কিনা? গোসলখানার উপরের দিক যদি খোলা থাকে-তাহলে উলঙ্গ হওয়া জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ ফরয গোসলের জন্য শর্ত হলো সমস্ত শরীরে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি পৌঁছিয়ে দেওয়া বা প্রবাহিত করা। সমস্ত শরীর বলতে গলার ভেতরের হলক এবং নাকের ভিতরের হাড্ডিও বুঝায়। (গোসলে তিন ফরয (১) নাকে পানি দেওয়া, (২) গরগরা করা ও (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা-জলিল)। কাপড় পরিহিত অথবা উলঙ্গ যেভাবেই হোক- তা জায়েয হবে। তবে উপর দিকে উন্মুক্ত গোসলখানায় উলঙ্গ না হওয়াই উত্তম। আর যদি আশেপাশে উচ্চ দালানে লোকবসতি থাকে- তাহলে কাপড় পরিধানের তাকিদ রয়েছে। মানুষের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা যত বেশী হবে- তাকিদও তত বেশী হবে। আর যদি মানুষের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়, তাহলে লুঙ্গি বা কাপড় পরিধান করে গোসল করা ওয়াজিব হবে। উলঙ্গ হয়ে গোসল করা কেবল ঐ আশঙ্কা অবস্থাতেই গুনাহ্ হবে-নতুবা নয়। (তবে ভ্রত্তা ও শালীনতার খেলাফ-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-১০ ঃ একটি কুয়া বা হাউজ যদি ১০X১০ হাত হয় এবং পানি ভর্তি থাকে; আর তাতে যদি ইঁদুর বা এ জাতীয় প্রাণী পড়ে মরে পঁচে গলে পানির সাথে মিশে যায়- তাহলে কতটুকু পানি উত্তোলন করলে পানি পাক হবে?

জওয়াব ঃ যদি কুয়া ১০X১০ হাত বা ১০০ বর্গ হাত হয়, তাহলে পানি নাপাক হবে না। এর চেয়ে কম হলে সামান্য নাপাক বস্তু পড়লেও সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে-যদিও গভীরতা বেশী হোক অথবা পাইপ দিয়ে পানি আসতে থাকুক না কেন।

নাপাক কুয়া পাক করার নিয়ম ঃ

কুয়া বা হাউজে যে পরিমাণ পানি বর্তমানে রয়েছে-তা সব তুলে ফেলে দিতে হবে। পানির পরিমাণ নির্ধারণ করার পদ্ধতি হলোঃ একটি রশির মাথায় পাথর বেঁধে নীচের দিকে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিবে। যখন পাথর নীচের তলায় গিয়ে ঠেকবে, তখন রশির উপরের অংশে পানির সমান চিহ্ন দিয়ে কুয়ার কিছু পানি উত্তোলন করে ওজন করবে। এরপর পুনরায় রশি ফেলে দেখবে-রশির কতটুকু পানি উঠলো। রশির যে পরিমাণ পানি উঠলো, তা যদি একশত বালতি হয়, তাহলে বাকী অংশে কতটুকু পানি আছে-তা সহজে বুঝা যাবে। এখন কুয়ার সেই পরিমাণ পানি উত্তোলন করলেই কুয়া পাক হয়ে যাবে। নীচের থেকে পানি উপরে উঠতে থাকলেও পূর্বের মূল পানি পরিমাপ করে ফেলে দিতে কষ্ট হবে না। এভাবেই কুয়ার সব পানি ফেলা হয়েছে বলে গন্য হবে।

ছাওয়াল-১১ ঃ একজন গর্ভবতী মহিলা একটি পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট করলো। জন্মের ৮ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় সে নামায রোযা করতে পারবে কিনা? না-কি-৪০ দিন অপেক্ষা করবে? ভুমিষ্টের কারণে কি হাতের চুড়ি, খাট, চৌকি বা ঐ ঘর নাপাক হয়?

জওয়াব ঃ অজ্ঞ মহিলাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে-৪০ দিন না গেলে শরীর পাক হয় না। তাদের এ ধারণা ভুল-বরং সাথে সাথেও যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায়-তাহলেও পাক হবে এবং নামায রোযা করতে হবে। সন্তান ভুমিষ্টের পর রক্ত দর্শন সাপেক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত নামায রোযা বন্ধ রাখবে। রক্ত দেখা না গেলে সাথে সাথেই গোসল করে পাক হয়ে যাবে। কেননা, নেফাসের জন্য নিম্নতম কোন মুদ্দাত নেই। হায়েযের ক্ষেত্রে কেবল নিম্নে তিনদিন নামায রোযা ছেড়ে দিতে হবে এবং উর্দ্ধে রক্ত দেখা সাপেক্ষে ১০ দিন পর্যন্ত মুদ্দাত পালন করতে হবে। স্বামী প্রথমেই স্ত্রীকে এই শিক্ষা দিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর, ভূমিষ্টের কারণে মহিলার গায়ের কোন অলঙ্কার, ঘর বা আসবাবপত্র কিছুই অপবিত্র হবেনা। ঐরূপ মনে করা হিন্দু আচার আচরণ মাত্র।

ছাওয়াল-১২ ঃ কোন উর্দ্দু কিতাব বা সংবাদপত্রের মধ্যে কিছু কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত থাকলে ঐ কিতাব বা সংবাদপত্র বিনা অযুতে স্পর্শ করা যাবে কিনা ?

জওয়াব ঃ কিতাব বা সংবাদপত্রের যেই জায়গাটুকুতে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা আছে- শুধু ঐ জায়গাটুকুতে বিনা অযুতে হাত লাগানো যাবেনা। বাকী অংশে বা কিতাবের উপরের কভারে বিনা অযুতে হাত লাগানো জায়েয। স্পর্শ না করে বিনা অযুতে ঐ জায়গাটুকুর আয়াতও পড়া যাবে- কিন্তু শরীর যদি নাপাক থাকে- তাহলে পড়া যাবে না।

ছাওয়াল-১৩ ঃ আমর নামের এক ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে। গোসল করতে যাওয়ার সময় পথে যায়েদ নামে এক ব্যক্তির সাথে দেখা। যায়েদ তাকে সালাম করলো। অপবিত্র অবস্থায় আমর সালামের জওয়াব দিতে পারবে কিনা? অপবিত্র অবস্থায় মনে মনে কালামে এলাহী বা দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ কোরআন মজিদ মনে মনে ধ্যান করতে পারবে- কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে পারবেনা। কুল্লি করে দরূদ শরীফ পড়তে পারবে। অদ্রুপ সালামের জওয়াবও দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো- তায়াম্মুম করে দরূদ শরীফ পড়া অথবা সালামের জওয়াব দেওয়া। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়াম্মুম করে সালামের জবাব দিতেন। তানভীরুল আবছার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-"নাপাক ব্যক্তি বা হায়েয নেফাছওয়ালী মহিলাদের জন্য কোরআনের পাতায় নজর করা মাকরুহ এবং দোয়া দরূদ পড়াও মাকরূহ"। ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে যে,-"হেদায়া গ্রন্থে লিখা আছে- আল্লাহর যিকির অযু সহকারে পাঠ করা মোস্তাহাব"। বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে-"মোস্তাহাব ছেড়ে দিলে মাকরূহ হয়না"।

ছাওয়াল-১৪ ঃ নাপাক অবস্থায় যদি শরীরে ঘাম হয় এবং কাপড় সিক্ত হয়ে যায়- তাহলে ঐ কাপড় নাপাক হবে কিনা?

জওয়াব ঃ না, কাপড় নাপাক হবে না। কারণ শরীরের ঘাম মুখের লালার মতই পাক। দুররুল মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে-"মানুষের উচ্ছিষ্ট খাদ্য পাক-যদিও সে ব্যক্তি নাপাক বা কাফের হোক না কেন"। শরীরের ঘাম উচ্ছিষ্ট খাদ্যের ন্যায়- সুতরাং উহাও পাক।

ছাওয়াল-১৫ ঃ শীতকালে নামাযের সময় চাদর বা শাল দ্বারা মাথা ঢেকে নামায পড়া জায়েয কিনা? নাকি মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে এরূপ করা নাজায়েয? "চেরাগে হেদায়াত" নামক গ্রন্থে মাথায় চাদর ঢেকে নামায পড়াকে মাকরুহ বলা হয়েছে। এ ব্যপারে কিতাবের এবারতসহ জবাব উল্লেখ করলে উপকৃত হবো।

জওয়াব ঃ নামাযের সময় শীতকালে চাদর বা শাল দ্বারা মুখ ছাড়া মাথা ঢেকে নেওয়া উচিৎ। নামাযের বাইরে ইচ্ছা করলে মাথা ঢাকতেও পারেন-আবার নাও ঢাকতে পারেন। এতে মেয়েলোকের সাথে সাদৃশ্যের কথা বলা মুর্খতা।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে-"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটে আরোহী অবস্থায় মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতেন"। জামে তিরমিযিতে উল্লেখ আছে- আনাছ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বার্ণিত-"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মোবারকে এতবেশী সময় কাপড় বা চাদর রাখতেন যে, তা মাথার তেলে ভিজে যেতো"। তাবরানীর মো'জামে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে-হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আনাছ (রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন "মাথায় রুমাল বা চাদর রাখা ঈমানদারের লক্ষন"।

নামাযে মাথায় চাদর মুড়ি দেওয়াকে মাকরূহ বলা মুর্খতা ও ভিত্তিহীন। নির্ভরযোগ্য কোন ফিকাহগ্রন্থেই এরূপ করাকে মাকরূহ বলা হয়নি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ ছায়ীদ ইবনে মানছুর (রাহঃ) বলেন- "আমি ইমাম হাসান (রাঃ) কে মাথায় চাদর দিয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি"।

হ্যাঁ, চাদর দ্বারা নাক, মুখ, দাঁড়ি- ইত্যাদি ঢেকে ফেললে অবশ্যই মাকরূহ হবে। কিন্তু মাথা ঢাকলে মাকরূহ হবে না। মো'জামে কবীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়ে মারাকিউল ফালাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-কেউ যেন চাদর দ্বারা দাঁড়ি ঢেকে নামায না পড়ে। কেননা, ইহা শয়তানের বেশ"। মুসনাদে আহমদ, সুনানে আরবা এবং মোস্তাদরাকে হাকিম-এ সহী সনদের মাধ্যমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যেন কেউ মাথায় বা কাঁধে চাদর দিয়ে দুই পাশে ছেড়ে না দেয়। মুখ ঢেকে ফেলতেও তিনি নিষেধ করেছেন। মুসনাদে ফিরদাউছ-এ উল্লেখ আছে- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "রাছুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন"- কেউ যেন নামাযে দাঁড়িয়ে চাদর দ্বারা দাঁড়ি না ঢাকে- কেননা দাঁড়ি মুখেরই অংশ"।

এসব এবারত ও হাদীসের দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেলো- চাদর মাথার উপর রাখা অথবা কাঁধে রাখা মাকরূহ নয়-বরং মাকরূহ হবে তখন-যখন মুখ, নাক বা দাঁড়ি ঢেকে ফেলে-অথবা চাদরের দুই কিনারা দুই দিকে ছেড়ে দেয়। বাহরুর রায়েকের গ্রন্থকার দুররুল মোখতারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন-**"নামায অবস্থায় চাদর দ্বারা মাথা ঢাকলে মাকরূহ নয়-বরং দুই পাশে ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ"**।

হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, শীতকালে মাথায় চাদর না জড়ানোই বরং মাকরূহ। আবু নোয়াইম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত এভাবে বর্ণনা করেছেন- "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দিকে রহমতের নজরে তাকান না- যারা পাগড়ীর উপরে চাদর রাখেনা"।

ছাওয়াল-১৬ ঃ নামাযের জামাত শুরু হয়েছে। সামনের কাতারগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন সময় একজন মুসল্লী এসে শরীক হলো। সে কি একা পিছনের কাতারের ডান দিকে দাঁড়াবে-নাকি বাম দিকে-নাকি মধ্যখানে ইমামের বরাবর? যদি ইমামের বরাবর পিছনে দাঁড়ায়, তাহলে কি সে সামনের কাতার হতে একজনকে টেনে এনে তার সাথে দাঁড় করাতে পারবে? যদি তা জায়েয হয়-তাহলে কি সামনের ফাকা জায়গা পুরন করার জন্য দুপাশের মুসল্লীদেরকে উক্ত জায়গা

ভরাট করার জন্য বলতে পারবে? এটা তার জন্য কতটুকু দুরস্ত হবে? তার কথায় সায় দিয়ে যদি সামনের মুসল্লীরা পিছনে এসে খালি জায়গা পূরণ করে নেয়, তাহলে তাদের নামায শুদ্ধ হবে কিনা? যে ব্যক্তি তার কথায় পিছনে আসলো, তার নামায শুদ্ধ হবে কিনা?

জওয়াব ঃ পরে আগত মুসল্লী ইমামের বরাবর পিছনের কাতারে একলা দাঁড়াবে এবং সামনের একজনকে শুধু ইশারা করে পিছনে তার সাথে আসতে বলবে- টেনে আনা নিষেধ। আর যাকে ইশারা করে, তাঁর উচিৎ তাঁর কথায় না এসে নিজের ইচ্ছায় পিছনে আসবে, তাহলে মাকরূহ হবেনা। কেননা, তার যতটুকু করনীয় ছিল- ততটুকু সে করেছে। দলীল ঃ

এব্যপারে ফতহুল কাদীর, দুরুরে মোখতার ও শামীতে উল্লেখ আছে- "একাকী ব্যক্তি যদি সামনের কাতারের কাউকে টেনে পিছনে আনে এবং উক্ত ব্যক্তি তার টানে পিছনে নেমে আসে- তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে"। (কারণ সে ইমাম ব্যতিত অন্যের হুকুম পালন করেছে)।

হ্যাঁ যদি সে শরিয়তের হুকুম পালনার্থে স্বেচ্ছায় দুই কদম পিছনে নেমে আসে- একাকী ব্যক্তির কথায় নয়- তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে। (মোদ্দাকথা- তার নিয়তের উপরে নামায হওয়া- না হওয়া নির্ভর করবে- জলিল)।

এবার সামনের ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পিছনে হটে আসার পর প্রথম ব্যক্তি যদি বলে- আপনারা সামনের খালি জায়গা পূরণ করুন- তাহলে এটা হবে বেহুদা কথা। সামনের কাতারের মুসল্লিরা যদি তার কথায় সায় দেয় এবং পিছনের খালি জায়গা পূরণ করে, তাহলে তাদের নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি শরিয়তের হুকুম পালনার্থে নিজেরা স্বেচ্ছায় খালি জায়গা পূরণ করে, তাহলে নামায শুদ্ধ হবে" (এটাও নিয়তের উপর নির্ভরশীল-তাহাভী শরীফ)।

ছাওয়াল-১৭ ঃ শরীর নাপাক অবস্থায় শুধু হাত-মুখ ধুয়ে ও কুল্লী করে খানাপিনা খাওয়া মাকরূহ হবে কিনা?

জওয়াব ঃ অযু বা তায়াম্মুম না করে নাপাক অবস্থায় শুধু হাত মুখ ধুয়ে কিছু পানাহার করলে মাকরূহ হবে না। তবে উত্তম হলো গোসল করে পানাহার করা। কোন কারনে গোসলে বিলম্ব হলে অন্ততঃ অযু করে পানাহার করবে। কেননা, যেখানে নাপাকী থাকে- সেখানে

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহমতের ফিরিস্তা আসেনা। হাদীস শরীফে এরূপই বর্ননা আছে।

এখন ফিকাহ গ্রন্থের ফতোয়া দেখা যাক। দুররে মোখতারে আছে-

لَا بَأْسَ بِأَكْلٍ وَّشُرْبٍ بَعْدَ مَضْمَضَةٍ وَّغَسْلِ يَدٍ وَاَمَّا قَبْلَهَا فَيُكْرَهُ لِلْجُنُبِ -

অর্থাৎ ঃ "নাপাক অবস্থায় শুধু কুল্লি করে এবং হাত-মুখ ধুয়ে কিছু পানাহার করা দোষনীয় নয়। হাত-মুখ না ধুয়ে, কুল্লি না করে পানাহার করা মাকরূহ"।

ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে-

وَضُوْءُ الْجُنُبِ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ مُسْتَحَبٌّ كَوُضُوْءٍ لِّلْحَدَثِ -

অর্থাৎঃ "অযু করে নাপাক ব্যক্তির জন্য পানাহার করা মোস্তাহাব- যেমন অযু ভেঙ্গে গেলে পুনরায় অযু করে নেওয়া মোস্তাহাব"।
(উল্লেখ্য, মোস্তাহাব তরক করলে মাকরূহ হয় না- অনুবাদক)।

ইমাম তাহাভী (রাঃ) তাঁর শরহে মাআনিউল আছার গ্রন্থে হযরত মালেক ইবনে উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন- তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাবাতের গোসলের পূর্বে খানা খেতে দেখেছেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট এই ঘটনাটি আলোচনা করলে হযরত ওমর তাঁকে টেনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যান এবং মালেক (রাঃ)-এর বর্ণিত ঘটনার সত্যতা জানতে চান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-

نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأْتُ اَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلٰكِنِّيْ لَا اُصَلِّيْ وَلَا اَقْرَءُ حَتّٰى اَغْتَسِلَ -

অর্থাৎ ঃ "হ্যাঁ, আমি অযু করে খানাপিনা খাই- কিন্তু নামায পড়িনা এবং কোরআনও তিলাওয়াত করিনা- যে পর্যন্ত না গোসল করি"।
(বুঝা গেল-অযু করে খানাপিনা খাওয়া মোস্তাহাব। তবে অযু না করলে মাকরূহ হবে না। যদি হাত মুখ না ধোয় এবং কুল্লি না করে পানাহার করে-তাহলেই কেবল মাকরূহ হবে- জালিল)।

ছাওয়াল-১৮ ঃ নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা কি জায়েয-না কি নাজায়েয?

জওয়াব ঃ নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। তবে, যদি যুক্তিসঙ্গত ওযর থাকে। যেমনঃ (১) কুয়া, বালতি ও রশি মসজিদের

ভিতরে থাকলে তা সংগ্রহ করতে (২) কোন শত্রু যদি আক্রমন করে এবং মসজিদ ছাড়া আশ্রয়ের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে। উপরোক্ত দুই অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। তবে মসজিদে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে তৈয়ম্মুম করে নিবে। অদ্রুপ নাপাক অবস্থায় যদি রোগীকে গরম পানি সংগ্রহের জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হয়-এ ছাড়া গরম পানি সংগ্রহ করার অন্য কোন উপায় না থাকে-তাহলেও তৈয়ম্মুম করে প্রবেশ করতে পারবে।

ছাওয়াল-১৯ ঃ গোসল ফরয হলে ইমাম বা মুয়াজ্জিন মসজিদের লোটা, বদনা বা বালতি নাপাক হাতে স্পর্শ করতে পারবে কিনা?

জওয়াব ঃ হাতে যদি নাপাকি থাকে-তাহলে দুরস্ত হবে না। লোটা যদি নিজের হয়, তাহলেও দুরস্ত হবেনা। কেননা, বিনা কারনে পাক জিনিসকে নাপাক করা গুনাহ। বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

تَنْجِيْسُ الطَّاهِرِ حَرَامٌ -

অর্থাৎ ঃ "পাক বস্তুকে নাপাক করা হারাম"। হ্যাঁ, যদি হাতে নাপাকী না থাকে, তখন লোটা-বালতি ধরতে পারবে- যদিও হাত বা লোটা ভিজাই হোকনা কেন।

ছাওয়াল-২০ ঃ পেশাব-পায়খানায় উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা অযু করা জায়েয হবে কিনা? এই পানি ও নতুন পানির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, ইস্তেঞ্জায় উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা অযু করা জায়েয আছে। এতে অযুর সম্মানের কোন লাঘব হবেনা। কেননা, এই পানি পেশাব-পায়খানায় ব্যবহৃত হয়নি। (তবে অযুতে বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত পানি দ্বারা পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা অনুত্তম হবে-অযুর পানির সম্মানের কারনে-অনুবাদক)।

ছাওয়াল-২১ ঃ খিচুঁড়ি অথবা ভাতে অথবা পানের চুনের মধ্যে যদি ইঁদুরের পায়খানা পাওয়া যায়-তাহলে খাদ্য কি নাপাক হবে?

জওয়াব ঃ খিচুঁড়ি, ভাত বা অন্য কোন শুকনা খাদ্যে ইঁদুরের পায়খানা পাওয়া গেলে ঐ পায়খানা এবং তৎসংলগ্ন কিছু খাদ্য ফেলে দিয়ে সন্দেহমুক্ত বাকী খাদ্য খাওয়া জায়েয-যদি খাদ্যের মধ্যে তার রং, স্বাদ বা গন্ধ না এসে থাকে। আর শক্ত চুনের মধ্যে পাওয়া গেলে তৎসংলগ্ন কিছু চুন ফেলে দিয়ে বাকী চুন ব্যবহার করা যাবে। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

খিচুঁড়ি বা চুন বা তরকারী যদি নরম বা লুজ হয়-তাহলে সব হারাম হবে।

ছাওয়াল-২২ ঃ কোরবানী বা আক্বিকার চামড়া বিক্রি করে ঐ টাকা সরাসরি মসজিদ বা দ্বীনী মাদ্রাসায় খরচ করা যাবে কিনা? নাকি মিসকিনকে প্রথমে মালিক বানিয়ে পরে হিলা করে দিতে হবে?

জওয়াব ঃ চামড়া বিক্রি না করে সরাসরি মসজিদ বা মাদ্রাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে। আর যদি মাদ্রাসা বা মসজিদে দেওয়ার নিয়তে চামড়া বিক্রি করে-তাহলেও দেওয়া দুরস্ত হবে। কিন্তু এমনিতে বিক্রি করলে উক্ত টাকা ফকির মিসকিনকেই দান করতে হবে।

তাবয়ীনুল হাক্বায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- لِاَنَّهُ قُرْبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ-

অর্থাৎ ঃ "ইহা (কুরবানীর চামড়া) সাধারন সদকা খয়রাতের ন্যায়"। (যেখানে-সেখানে দান করা যাবে-জলিল)।

কোরবানী বা আক্বিক্বার চামড়া বা তার মূল্য শুধু মিসকিনের হক্ব মনে করা শরিয়তের উপর জবরদস্তি। ইহার কোন দলীল নেই। নিজে নিজে শরিয়ত প্রবর্তন করা যায়না। মূল চামড়া নিজের কাজেও ব্যবহার করতে পারবে। হ্যাঁ, যদি নিজের খরচের জন্য বিক্রি করে, তবে তা নিজের জন্য খরচ করতে পারবেনা-বরং ফকির মিসকিনকে সদকা করে দিতে হবে। এমতাবস্থায়, বিক্রিত মূল্য মসজিদ বা মাদ্রাসায়ও দিতে পারবে না। হাঁ, মসজিদ ও মাদ্রাসায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করলে তা দেয়া যাবে।

(মুল কথা হলো-কোরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া যেমন জায়েয-তেমনিভাবে চামড়া দ্বারা নিজে কিছু তৈরী করাও জায়েয। মসজিদ মাদ্রাসায় সরাসরি চামড়া দান করাও জায়েয এবং এই উদ্দেশ্যে বিক্রি করে ঐ টাকা দেওয়াও জায়েয। কিন্তু নিজের জন্য চামড়া বিক্রি করলে ঐ টাকা খাওয়া যাবেনা, মসজিদে দেওয়া যাবে না। তখন একমাত্র ফকির মিসকিনকেই দান করা ওয়াজিব। মাসআলাটি খুবই সুক্ষ- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-২৩-২৭ ঃ (ক) কবরস্থানের জায়গা বিক্রি করা বা রেহান দেওয়া জায়েয আছে কি না?

(খ) কবরস্থানের জায়গা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে কিনা? পারিবারিক কবরস্থান বানানো জায়েয কিনা?

(গ) কবরস্থান ধ্বংস করা, বিরান ভুমিতে পরিণত করা, অথবা খনন

করা থেকে বিরত রাখার জন্য বাধা দেওয়া কোন মুসলমানের জন্য ফরয কিনা?

(ঘ) কবরস্থান বা সংশিস্নষ্ট জায়গায় পেশাব পায়খানা করা, ময়লা ফেলা বা ময়লাখোলায় পরিণত করা বৈধ কিনা এবং শরিয়তে এর সাজা কি?

(ঙ) মুসলমানের ওপর কবরস্থানের সম্মান করা ওয়াজিব কিনা?

জওয়াব ঃ (ক,খ,গ) সর্বসাধারনের কবরস্থান ওয়াক্ফকৃত হয়ে থাকে। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি বিক্রি করা বা রেহান দেওয়া হারাম। যে কবরস্থান কারও ব্যক্তিগত মালিকানায় হয় এবং তাতে কিছু লোককে দাফনও করে থাকে, তবুও ঐ জমিন বিক্রি করতে পারবেনা-যদিও তা ওয়াকফ করে না দিয়ে থাকুক। কেননা, কবরস্থান বিক্রি করা বা রেহান দেওয়া মূর্দারগনের প্রতি অবমাননার শামিল। মৃতব্যক্তিদেরকে অবমাননা করা হারাম এবং সম্মান করা ওয়াজিব। বিরান করে ফেলা অথবা খননকার্য করা হারাম। এতে বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তবে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তার অনুমতি ব্যতিত দাফন করা হলে মৃত ব্যক্তির লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে খনন করা এবং ঐ জমিনে পরে ক্ষেতি ফসল করা বা ইমারত নির্মাণ করা জায়েয।

(ঘ) কবরস্থান বা জায়গায় পেশাব পায়খানা করা, ময়লা নিক্ষেপ করা, ময়লা ডিপো বানানো-সবই হারাম-শক্ত হারাম। এরূপ করা আল্লাহর আযাবও গযব ডেকে আনার শামিল।

(ঙ) কবরস্থানের উপর দিয়ে চলা, কবরের উপর বসা, পা রাখা-কোনটিই জায়েয নেই। শরিয়ত বিশেষজ্ঞ ইমামগন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কবরস্থানের উপর দিয়ে তৈরী নতুন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাও নাজায়েয। যদি কারও আত্মীয় স্বজনকে এমন জায়গায় কবর দেওয়া হয় যে, ঐখানে যাওয়ার জন্য অন্য কবরে পা না দিয়ে যাওয়া যায় না-তাহলে কবরের পাশে না গিয়ে দুর হতেই ফাতেহা পাঠ করবে। এর বিস্তারিত জানার জন্য আমার (আ'লা হযরতের) লিখিত কিতাব "এহ্লাকুল ওয়াবিয়ীন" দেখুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-২৮ ঃ কবরে বাতি জ্বালানো বা আলোকিত করার হুকুম কী?

জওয়াব ঃ কবরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতি জ্বালানো নিষেধ। প্রয়োজনমত জ্বালাতে পারবে। তদ্রুপ কবরের উপরে চেরাগ রাখাও নিষেধ। কেননা, কবরের উপরিভাগ কবরবাসীর সম্পত্তি।

উল্লেখিত বিষয় ছাড়া নিম্ন বর্ণিত কারণে কবরের পার্শে বাতি জ্বালাতে পারবে-যেমন-(১) কবরটি যদি রাস্তার উপরে বা রাস্তার মাথায় হয়, (২) কবরটি যদি কোন অলীর মাযার হয়। লোকদের নিকট তার মর্যাদা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং দোয়া প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে এবং দোয়া কবুলিয়তের বিশ্বাস নিয়ে তার মাযারকে জনগনের নিকট মর্যাদাবান করার মানসে আলোকিত করা দুরস্ত। এতে নিষেধ করার কোন শরয়ী ভিত্তি বা দলীল নেই। এই অধম (আ'লা হযরত ইমাম আহম্মদ রেযা) এ বিষয়ের উপর পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করেছি এবং নাম রেখেছি "তাওয়ালিউন নূর ফী হুকমিছ ছিরাজ আলাল কুবুর"। "(আমার লিখিত আহকামুল মাযারও দেখতে পারেন-অনুবাদক)"।

ছাওয়াল-২৯ ঃ কোন কোন দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে যে, দুই ঈদের দিনে অথবা ইস্তেছকার নামাযে লোকেরা সম্মিলিতভাবে পতাকা নিয়ে কাছিদা, গজল, নাত-ইত্যাদি ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করে দলবদ্ধভাবে যায়। এরূপ করা কেমন?

জওয়াব ঃ যদি মুসলমানদের ঐক্য ও শান-শওকত অন্য জাতির কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পতাকা নিয়ে ও গজল পরিবেশন করে ঈদগাহে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা জায়েয। তবে শুধু আমোদফুর্তি বা খেলাধূলার উদ্দেশ্যে এরূপ করা বৈধ নয়। শরিয়তের খেলাফ অন্য কোন কাজ না করলে ঐরূপ জুলুছ করা বৈধ। নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল শরিয়তে নেই। আল্লামা আবদুল গনি নাবলুছী (রাঃ) এবং আল্লামা শামী (রহঃ) বলেছেন- "হারাম বা মাকরুহ প্রমান করার জন্য দলীলের প্রয়োজন হয়, মোবাহ প্রমাণের জন্য খাস দলীলের প্রয়োজন নেই। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক কাজই মূলে মোবাহ- যদি তাঁর বিপরীতে নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন স্পষ্ট দলীল না থাকে"।

বুখারী শরীফে "বাবুল আলম বিল মোসল্লা" বা "ঈদগাহে নিশানা স্থাপন" শীর্ষক একটি অধ্যায়ে ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর একটি হাদীস উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ঈদগাহে

নিশানা বা চিহ্ন রাখা জায়েয। খোলা ময়দানে যেখানে ঈদের নামায হবে, সেখানে কোন চিহ্ন রাখাও জায়েয। যেমন, সাহাবী হযরত কাছীর ইবনে সালাত (রাঃ) -এর বাড়ীর স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায পড়তেন এবং জায়গাটিকে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- "আমি হুযুরের বিবি মায়মুনা (রাঃ)-এর ভাগিনা হিসাবে হুযুরের সাথে বাল্যকালে ঐ স্থানে ঈদের নামায পড়তে যেতাম এবং বর্তমানে কাছীর ইবনে সালাত (রাঃ)-এর বাড়ীর স্থানেই উক্ত জামাত অনুষ্ঠিত হতো। লোকেরা ঐ স্থানটিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন"। (বুখারী)।

সুতরাং, এতে যেমন খোলা ঈদগাহ নিশান দ্বারা চিহ্নিত করা প্রমাণিত হয়-তদ্রুপ নিশান নিয়ে যাওয়াও দুরস্ত। তবে, যে এলাকায় শিয়া বসবাস করে, সেখানে নিশান নিয়ে মিছিল করলে মহররমের তাজিয়ার সাথে সামঞ্জস্য মনে করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। কাজেই সুন্নীদের বেলায় এ অবস্থায় নিশান নিয়ে না যাওয়াই উত্তম- যাতে সুন্নীদেরকে শিয়া মনে না করা হয়। এতে অনেক ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সুন্নীদের নিশান আর শিয়াদের নিশানের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়। তাই এর থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(বাংলাদেশী ও বিহারী কিছু সুন্নী মুসলমান মহররমে আলম বহন করে। এতে মানুষ তাদেরকে শিয়া মনে করে। এরূপ করা সুন্নীদের জন্য অনুচিত- অনুবাদক)

ছাওয়াল-৩০ ঃ যে মসজিদের ভিতরে কবর আছে-সে মসজিদে নামায পড়া জায়েয কিনা? কবর যদি মসজিদের এক কোনায় ও বাইরে হয়, তাহলে হুকুম কি?

জওয়াব ঃ কবর যদি মসজিদের বাইরে এক কোনায় হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে জায়েয। এব্যপারে বাহরুর রায়েক গ্রন্থে মুর্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে- **"যদি হাম্মামখানায় কোন মূর্তি বা ছবি না থাকে, তাহলে গোসল করা জায়েয। অনুরূপ ভাবে কবরস্থানে নামায পড়াও জায়েয- যদি নামাযের জন্য পৃথক জায়গা নির্ধারিত থাকে এবং ঐজায়গায় যদি কোন কবর না থাকে। অর্থাৎ খালি পাক জায়গায় নামায পড়া জায়েয।**

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুনিয়াতুল মুছাল্লি ও গুনিয়াতুল মোবতাদী গ্রন্থদ্বয়েও অনুরূপ লিখা আছে। আমি (বাহরুর রায়েক) বলছি- "কবরস্থানে শত শত কবর থাকা সত্ত্বেও যদি মধ্যখানে নামাযের জন্য পৃথক জায়গা (মসজিদ) রাখা হয়, তাহলে যেভাবে জায়েয হয়-তদ্রুপ মসজিদের বাইরে কবর থাকলেও কোনই ক্ষতি নেই- বরং কবরস্থানের ঘেরাও করা মসজিদের তুলনায় এটা উত্তম। কারণ, মসজিদ হলো নামাযের জন্য তৈরী, আর কবরস্থান হলো কবরের জন্য নির্ধারিত। খোদ কবরস্থানের মসজিদে নামায জায়েয হলে কবরগুলো মসজিদের পার্শে হওয়াতে নাজায়েয হওয়ার কোনই কারণ নেই"। (বাহরুর রায়েক)।

এখন কথা হলো-কবর যদি মসজিদের ভিতরে পড়ে, তাহলে ঠিক কবরের উপরে সিজদা দেওয়া নাজায়েয। শামী কিতাবে এভাবেই উল্লেখ আছে- تُكْرَهُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْقَبْرِ وَاِلَى الْقَبْرِ-

অর্থাৎ-"কবরের উপরে এবং উন্মুক্ত কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম"। কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

ছোট মসজিদে অবস্থিত উন্মুক্ত কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু ময়দানে বা বড় মসজিদে (৪৭/৪৮ গজ) কবর থাকলে কবরটি যদি মসজিদের ভিতরে হয়, তাহলে খোলা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী হবে। আর যদি ডানে বা বাম দিকে খোলা কবর হয়, তাহলে মাকরূহ হবে না। ফতোয়া আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

اِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْرِ مِقْدَارُ مَا لَوْ كَانَ فِى الصَّلٰوةِ وَيَمُرُّ اِنْسَانٌ لَايُكْرَهُ فَهٰهُنَا اَيْضًا لَايُكْرَهُ-

অর্থঃ-"যদি নামাযী ও কবরের মধ্যখানে এতটুকু ফারাক থাকে যে, ইচ্ছা করলে একজন মানুষ কবর ও নামাযীর মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে- তাহলে মাকরূহ হবে না"। (আলমগীরী)।

ইমাম আলাউদ্দীন হাছকাফী দামেস্কী (রহঃ) দুররে মোখতারে বলেছেন-"ময়দানে বা বড় মসজিদে কবর থাকলেও নামায মাকরূহ হবে না- যদি কবরের উপরে সিজদা না পড়ে। যদি ছোট ঘর বা মসজিদে কবর থাকে এবং একজন লোক নামাযীর সামনে দিয়ে

অতিক্রম করতে পারে, তাহলেও মাকরূহ হবে না"। অন্যান্য ইমামগনের মতে যদি সিজদা কবরের উপর পড়ে, তাহলেই শুধু নামায নাজায়েয হবে।

ইরশাদুছ ছারী শরহে বোখারীতে উল্লেখ আছে "ইহুদীরা তাদের নবীদের রওযায় সিজদা দিত সম্মান করে এবং উহাকে কেবলা বানাতো নামাযের জন্য। তারা মাযারকে মুর্তিরূপে পূজা করতো। সেজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেউ যদি কোন বুযর্গ ব্যক্তির কবরের পার্শে মসজিদ তৈরী করে এবং বরকত লাভ করাই শুধু উদ্দেশ্য হয়, তাযীম করা বা তার দিকে ফিরে সিজদা করা উদ্দেশ্য না হয়-তাহলে এক্ষেত্রে হাদীসের অভিসম্পাত প্রযোজ্য হবে না"। (ইরশাদুছ ছারী)

শেখ আবদুল হক দেহলভী (রাঃ) আশিয়াতুল লোমআত শরহে মিশকাত গ্রন্থে লিখেছেন-

اِتِّخَاذُ مَسْجِدٍ لِجَوَارِ نَبِىٍّ اَوْعَبْدٍ صَالِحٍ وَالصَّلٰوةُ فِيْهِ عِنْدَ قَبْرِهٖ لَا لِتَعْظِيْمِهٖ اَوِالتَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقَبْرِ بَلْ لِحُصُوْلِ الْمَدَدِ مِنْهُ وَلِتَكْمِيْلِ الْعِبَادَةِ بِبَرَكَةِ مُجَاوَرَةِ اَرْوَاحِهِمِ الطَّاهِرَةِ فَلَا حَرَجَ فِىْ ذٰلِكَ-

অর্থঃ-"কোন নবী বা অলীর মাযারের পার্শে যদি এই উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করা হয় যে, তাতে বরকত হবে, দোয়া শীঘ্র কবুল হবে, তাযীম করা বা তার দিকে ফিরে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নয়- বরং উদ্দেশ্য এই হয় যে, এতে তাঁদের রুহানী মদদ পাওয়া যাবে এবং তাদের সান্নিধ্যের বরকতে ইবাদাত পূর্ণতা লাভ করবে- তা হলে কোনই অসুবিধা নেই"। (আশিয়াতুল লুমুআত)।

আরো দেখুন-হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও বিবি হাজেরার কবর শরীফ হাতীমে কা'বাতে অবস্থিত। বিবি হাজেরার কবরের ওপরই হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম বর্তমান খানায়ে কা'বা তৈরী করেছিলেন, পরে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কেও ভিতরে দাফন করা হয়। বর্তমান হাতীম অংশেই হযরত ইসমাইল (আঃ) ও বিবি হাজেরার কবর শরীফ পড়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে হাতীমে কা'বায় নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই নামাযকেই কা'বার ভিতরের নামায বলে ঘোষনা করেছিলেন। বিবি হাজেরার (আঃ)-এর কবরের উপরেই হাতীমে কাবা অংশ পড়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন-"আমার ইচ্ছা জাগলো-কা'বার ভিতরে ঢুকে নামায পড়বো। হুযুর পুরণুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হাতীমে নিয়ে গিয়ে বললেন-এখানেই নামায পড়ো, কেননা ইহা কা'বারই অংশ"। (সুতরাং মসজিদের ভিতরে মাযার বা কবর থাকা দোষনীয় নয়; তবে ঘেরাও দিয়ে রাখা কর্তব্য-অনুবাদক)।

দুররে মোখতার প্রনেতা আলাউদ্দীন দামেস্কী (রহঃ) বলেন, "হাতীমে কা'বার স্থানে হযরত বিবি হাজেরার কবর ছিল। কা'বা তৈরীর পরে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকেও এখানেই মায়ের পার্শে দাফন করা হয়। এখন হাজী সাহেবগন হাতীমে কাবায় নামায আদায় করছেন-যেহেতু মা আয়েশাকে এখানে নামায পড়তে নবীজী নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং নিষেধ করার ক্ষমতা কার আছে"? অনুরূপভাবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীও বেদায়া গ্রন্থে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। -**ইমাম আহমদ রেযা**। (সউদী সরকার বর্তমানে হাতীমে নামায পড়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে-জলিল)

আলা হযরতের এই ফতুয়াতে স্বাক্ষর করেছেন-
(১) আল্লামা নকী আলী (রহঃ), (২) আল্লামা ইয়াকুব আলী (রহঃ)
(৩) আল্লামা সোলতান হাসান (রহঃ), (৪) আল্লামা আহসান সিদ্দিকী (রহঃ)।

ছাওয়াল-৩১ ঃ হাকীম আব্দুলস্নাহ নামে জনৈক ব্যক্তির উক্তি হলো- "এজিদ ফাছেক ও ফাজের ছিলনা- অর্থাৎ সে ভাল লোক ছিল। তাকে খারাপ বলা যাবে না"।

সে একথাও বলেছে-সাইয়্যেদুনা ইমাম হোসাইন (রাঃ) এজিদের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত ছিলোনা "কেন গেলেন? কারবালার যুদ্ধটি ছিল সিংহাসন ও রাজ্য লাভের যুদ্ধ"। হাকীম সাহেবের সাথে ফজরের পর লোকজন মোছাফাহ করতে গেলে সে হাত গুটিয়ে নেয় এবং বলে- এটা বিদআত।

এখন প্রশ্ন হলো- হাকীম আব্দুল্লাহর এই উক্তি কি অসত্য নয়? এই উক্তির দ্বারা কি সে সাইয়্যেদুশ শোহাদা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর

উচ্চ মার্যাদার সাথে বেয়াদবী করেনি? সে কি মিথ্যাবাদী নয়? মোসাফাহা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া ও অস্বীকার করা দ্বারা কি সে একথা প্রমান করেনি যে, সে মোসাফাহাকে বিদয়াতে সাইয়েয়া মনে করে এবং তার একাজটি কি ওহাবীদের কাজ নয়?

জওয়াব ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নটিই জবাব হয়ে গেছে। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমতে নাপাক এজিদ ছিল ফাসেক ও ফাজের এবং কবিরা গুনাহে গুনাহ্গার। এতটুকু পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের সমস্ত ইমামগন একমত। শুধু মতপার্থক্য দেখা যায়-তাকে কাফের বলা ও অভিশাপ দেওয়া বা লা'নত দেয়ার ব্যাপারে। হানাফী ইমামগনের কোন মতামত এব্যাপারে উল্লেখ নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারীগন এজিদকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার নাম ধরে লা'নাতুল্লাহ বলেছেন। তাদের দলিল হচ্ছে কুরআন মজিদের একটি আয়াত-

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَٰئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔

অর্থাৎ ঃ "এটাই কি তোমাদের উচিত যে, তোমরা রাজ্যের মালিক হয়ে আল্লাহ্র জমিনে অন্যায় ও ফাসাদ শুরু করে দিবে এবং আপন আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিবে? এরাইতো সেই লোক- যাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত বর্ষণ করেছেন, তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন"। (আল-কোরআন)।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এজিদ ছিল স্বৈর-শাসক। সে বাদশাহ হয়েই আল্লাহর জমিনে ও দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। কারবালার ময়দানে নবীবংশের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর সে মক্কা মোয়াজ্জমা দখল করার লক্ষ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মদিনা মনোয়ারার মসজিদে নব্বীকে ৩দিন পর্যন্ত ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে রেখেছিল। ঘোড়ার পায়খানা ও পেশাবের দ্বারা মিম্বার শরীফকে অপবিত্র করেছিল। ৩ দিন পর্যন্ত মসজিদে নব্বীতে আযান দিতে ও নামায পড়তে দেয়া হয়নি। মদিনাবাসী সাতশত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিলার শ্লীলতাহানী করা হয়েছিল। এতে তাঁরা গর্ভবতীও হয়েছিলেন। মক্কা ও মদিনার অসংখ্য সাহাবী এবং তাবেয়ীকে শহীদ করা হয়েছিল। (প্রায় বার হাজার শহীদ হয়েছিলেন-"যযবুল কুলুব")।

কারবালায় এজিদ যে পৈশাচিক কান্ড ঘটিয়েছিল-তা বর্ণনা করলে শরীর শিউরে উঠে। নবীজীর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন (রাঃ) এবং নবীবংশের অন্যান্যদেরকে কারবালায় তিনদিন পর্যন্ত খাদ্য ও পানি বিহীন অবস্থায় নির্যাতন করেছিল সে। শাহাদাতের পর ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর দেহের উপর ঘোড়া দাবড়িয়েছিল। শির মোবারক বর্শায় গেথে এজিদী সৈন্যরা পথে পথে উল্লাস করেছিলো। নবী বংশের পবিত্র নারীদেরকে বেহুরমতি ও বেপর্দা করে তার দরবারে হাযির করেছিলো। এর চেয়ে বে-রহমী ও বেহুরমতি আর কি হতে পারে? তাই কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী এজিদ ও তার বাহিনী খোদার লা'নত পাওয়ার যোগ্য। এই জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাকে কাফের ও মালউন বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

"আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা (রাঃ) এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করে কুফরী ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। কেননা, নিদির্ষ্ট করে কাউকে কাফের বলতে হলে অকাট্য দলিল ও হাদীসে মোতাওয়াতির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি এজিদের কুফরীর ব্যাপারে এমন কোন অকাট্য দলিল ও হাদীসে মোতাওয়াতির পাওয়া যায় না। তাই তিনি কুফরীর ব্যাপারে সঙ্গত কারনে চুপ রয়েছেন। তবে তিনি তাকে ভালও বলেননি। কেননা, কুফরি ও কবিরা গুনাহ্ প্রমান করার জন্য অকাট্য দলিল প্রয়োজন। তওবা করা- না করার উপর পরকালের শাস্তি নির্ভরশীল। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ-

অর্থাৎ ঃ "তাদেরকে "গাই" নামক জাহান্নাম বা শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে-যদি তওবা না করে মরে যায়"। মৃত্যুর গরগরা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। তাই কুফরীর সঠিক প্রমান না পেলে সুনিদির্ষ্ট ভাবে কাউকে কাফের না বলাই সতর্কতামূলক কাজ।

তাই বলে এজিদের কু-কর্ম ও প্রকাশ্য কবিরাগুনাহ্ অস্বীকার করা এবং মযলুম ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর উপর দোষারোপ করা অবশ্যই

আহ্লে সুন্নাতের মৌলিক আক্বিদার পরিপন্থী, গোমরাহী এবং বেদ্বীনী কাজ-এতে কোন সন্দেহ নেই। যার অন্তরে নবী ও নবীবংশের মহব্বৎ রয়েছে- এমন লোকের পক্ষে ইমাম হোসাইনের উপর দোষারোপ করা ও এজিদকে সমর্থন করা কিছুতেই চিন্তা করা যায়না।

যে হাকীম সাহেব এরূপ মন্তব্য করেছে, সে অবশ্যই সাহাবী বিরোধী নাছেবী সম্প্রদায়ের লোক এবং আহ্লে সুন্নাতের দুশমন। তার সাথে মোছাফাহা করাই অনুচিত। সে আহ্লে বাইতের বিরুদ্ধে কথা বলে বিশুদ্ধ আক্বিদার পরিপন্থি কাজ করেছে- অপরদিকে স্বয়ং ফাতেমা ((রাঃ), হযরত আলী ও নবী করিম (দঃ)-এর অন্তরে ব্যথা দিয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্কেও সে কষ্ট দিয়েছে। কোরআনের বাণী -

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا-

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসুলকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করবেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব সৃষ্টি করে রেখেছেন"।

ছাওয়াল-৩২ ঃ মৌলভী আশ্রাফ আলী, জেলা শাহজাহানপুর (হিন্দুস্থান) নামক জনৈক ব্যক্তি বেরেলীর একটি মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন মোদাররেছী করেছে। ঐ মাদ্রাসাটি ওহাবী মাদ্রাসা। সে ঐ মাদ্রাসার নিয়মকানুন মেনে চলেছে। সে রাসুলে পাকের ইলমে গায়েব সম্পর্কে গোমরাহীপূর্ন কথাবার্তা বলে। ইহা কি তার ওহাবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

তার মন্তব্য হলো-"যারা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব স্বীকার করে এবং রোজে আজল হতে কেয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে সুক্ষাতিসুক্ষ গায়েবী জ্ঞান তাঁর জন্য সাব্যস্ত করে, অতীত-ভবিষ্যতের যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে এবং পাঁচটি বিষয়ের ইলমে গায়েব নবীজীর জন্য সাব্যস্ত করে, তারা নাকি গোমরাহ্ ও গোমরাহ্কারী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধী?

হারামাঈন শরিফাঈনের মুফতীগন যেসব সুন্নী আকাবেরীন ওলামাদের প্রশংসা করেছেন (যেমন ইমাম আহমদ রেযা)-তাদের সর্ম্পকে এই মৌলভী আশ্রাফ আলী অসৌজন্যমূলক উক্তি করে থাকে। ৩১ নম্বরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত হাকীম আব্দুল্লাহও তার একই হামখেয়াল। ব্যতিক্রম শুধু মোদাররেছীতে। উভয়জনই দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাছেম নানুতবী, মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশ্রাফ আলী থানবীকে নেতা ও মুরুব্বী মানে। তারা উভয়েই ওদেরকে আহ্‌লে সুন্নাতের নেতা বলে দাবী করে। এই দুইজনই কি বিদআতী আকিদাপন্থী নয়? এদের সাথে কি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিৎ নয়- যেরূপ করার নির্দেশ এসেছে হাদীসে-যা ফতোয়া আল-হারামাঈন-এ উল্লেখিত হয়েছে?

যেমন, উক্ত কিতাবে সহিহ্ মুসলিমের একখানা হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল পন্থী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

اِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

অর্থাৎ ঃ "তাদের সংস্পর্শ ও সংসর্গ হতে নিজেদেরকে বাঁচাও এবং তাদেরকেও তোমাদের সংস্পর্শ হতে দূরে রাখো-যাতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং ফিতনার মধ্যে ফেলতে না পারে"। (মুসলিম)।

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

وَاِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ-

অর্থাৎ ঃ "অসুস্থ হলে তাদের সেবা করতে যেয়োনা এবং মরে গেলে তাদের জানাযাতেও শরিক হয়োনা" (আবু দাউদ)।

ইবনে মাজা শরীফে হযরত জাবের (রাঃ)-হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

وَاِنْ تَقْتَسِمُوْهُمْ فَلَاتُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ-

অর্থঃ-"যখন তাদের মুখোমুখী হয়ে যাও, তখন তাদেরকে সালামও দিওনা" (ইবনে মাজা)।

ইমাম ওকায়লী (রহঃ) কর্তৃক হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে- وَلَاتُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوْهُمْ وَلَاتُنَاكِحُوْهُمْ-

অর্থাৎ ঃ "তাদের মজলিসে বা তাদের সাথে উঠাবসা করবে না, তাদের সাথে পানাহার করবেনা এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধও

করবেনা"। (ওকায়লী)।

"ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আর একটি শব্দ অতিরিক্ত এসেছে -وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ **"তাদের সাথে বা পিছনে নামাযও পড়বেনা"** (ইবনে হিব্বান)।

দায়লামীতে হযরত মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন -

اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءُ وْا مِنِّىْ - جِهَادُهُمْ كَجِهَادِ التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ-

অর্থাৎ ঃ "আমি ঐ বেদআতী আকিদার লোকদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমার বন্ধন থেকে মুক্ত, তাদের বিরূদ্ধে জেহাদ করা তুর্কী ও দায়লামীদের বিরূদ্ধে (কাফির) জেহাদ করার সমতুল্য"। (দায়লামী)।

ইবনে আছাকির কর্তৃক হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন -

اِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَانْفِرُوا فِىْ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْغِضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ وَلَايُجَاوِزُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ لٰكِنْ يَتَنَافَتُوْنَ فِى النَّارِ مِثْلَ الْجَرَادِ وَالذُّبَابِ-

অর্থাৎ ঃ "যখন কোন বদ মযহাবী লোককে (আহ্‌লে বিদআত) দেখবে, তখন তার সম্মুখেই তার প্রতি ঘৃনা পোষন করবে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক আহ্‌লে বেদআতকে ঘৃণা করেন। তারা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় টুকরা টুকরা হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে- যেভাবে পতঙ্গ ও মাছি আগুনে পুড়ে মরে"। (ইবনে আছাকির)।

তাবরানী কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বশির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ-

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থী লোককে (বাতিলপন্থী) সম্মান করলো, সে নিশ্চিত দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করতে সহযোগিতা করলো"। (তাবরানী)।

আবু নোয়াইম-এর হিল্‌ইয়া নামক গ্রন্থে হযরত মুয়ায (রাঃ) কর্তৃক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত হাদীসে প্রিয় রাসুল (দঃ) এরশাদ করেছেন -

مَنْ مَّشٰى اِلٰى صَاحِبِ بِدْعَةٍ لِيُوَقِّرَهٗ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ-

অর্থাৎ ঃ **"যে ব্যক্তি কোন বাতিলপন্থীর (বিদআত পন্থী) দিকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো, সে নিশ্চয়ই দীন ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো"**। (আবু নেয়াইম)।

আকায়েদ গ্রন্থসমূহে (শরহে মাকাছেদ) উল্লেখ আছে-"বাতিলপন্থী সম্পর্কে শরিয়তের নির্দেশ হলো-তার প্রতি ঘৃণা প্রর্দশন করবে, তাকে হীনভাবে তুচ্ছজ্ঞান করবে, তার কথা অগ্রাহ্য করবে এবং তাকে দুরে রাখবে"। (শরহে মাকাছেদ)।

হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে হযরত ফুজায়ল (রহঃ)-এর উক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন -

قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عَيَاذٍ-مَنْ اَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ اَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهٗ وَاَخْرَجَ نُوْرَ الْاِيْمَانِ مِنْ قَلْبِهٖ وَاِذَا عَلِمَ اللّٰهُ عَنْ رَجُلٍ اَنَّهٗ مُبْغِضٌ لِّصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَّغْفِرَ ذُنُوْبَهٗ وَاِنْ قَلَّ عَمَلُهٗ وَاِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِىْ طَرِيْقٍ فَخُذْ طَرِيْقًا اُخَرَ-

অর্থাৎ ঃ **"যে ব্যক্তি বিদাতপন্থী বা বাতিলপন্থীর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, আল্লাহ্ তার আমল বরবাদ করে দিবেন এবং ঈমানের নূর তার হৃদয় হতে বের করে নিবেন। আর আল্লাহ্ পাক যখন দেখেন যে, তার কোন বান্দা বাতিলপন্থীর সাথে বিদ্বেষভাব পোষন করছে, আমার (ফোজায়ল) বিশ্বাস-আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন-যদিও তার নেক আমল স্বল্পই হোকনা কেন। তোমরা যখন কোন বদ মাযহাব বা বাতিলপন্থীকে আসতে দেখবে, তখন অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যাবে"**। (ফোযায়ল সূত্রে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন)।

এখন প্রশ্ন হলো-পবিত্র শরিয়ত যেখানে বাতিলপন্থীদের সম্পর্কে এত ঘৃনা প্রকাশ করেছে, সেখানে খাঁটি মুসলমানদের কি ফরয নয় যে, তাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়া, তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা? বিশেষ করে এলাকার প্রভাবশালী লোক-যাকে মুসলমানরা

মানে এবং ইজ্জত সম্মান করে- চাই এলেমের কারণে হোক অথবা পীর হওয়ার কারণে হোক। তাঁর শক্তিসামর্থ থাকলে এমন ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করতে প্রবলভাবে বাধা দেওয়া উচিত এবং বাতিলপন্থীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি উক্ত মৌলভী আশ্রাফ আলী বা হাকীম আব্দুল্লাহ্র বাতিল আকিদা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে ইমাম নিযুক্ত করবে, তার পিছনে নামায পড়বে, আর বলবে- এটা মাওলানা সাহেবদের ঝগড়া-আমাদের কি প্রয়োজন এতে নাক গলানোর? উভয়েই তো আলেম এবং ভাল বক্তাও বটে।

যে ব্যক্তি তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয বলে মনে করবে, বাতিল বলে মনে করবে না এবং দ্বীনের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টিকারী বলেও মনে করবে না, সে ব্যক্তি অবশ্যই তাদের লোক।

উপরোক্ত মৌলভী সাহেব ও হাকীম সাহেব দেওবন্দের নানুতবী, গাঙ্গুহী ও থানবীকে মুরুব্বী মনে করে-অথচ তাদের বিরুদ্ধে হারামাঈন শরিফাঈনের মুফতীগন যে ফতোয়া দিয়েছেন-তা সে মানে না।

নিম্নে মক্কা-মদিনার ফতোয়া উল্লেখ করা হলো ঃ

"গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, তার অনুসারী খলীল আহমেদ আম্বেটি, আশ্রাফ আলী থানবী-প্রমুখদের কুফরী আকিদার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বরং যারা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করবে অথবা কোন অবস্থায় কোনভাবে কাফের বলতে ইতস্ততঃ করবে অথবা চুপ থাকবে-তার কুফরীর ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই"। ফতোয়ার আরবী এবারত হলো-

اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْعُرَاقِ الْوَاقِعِيْنَ فِى السُّوَالِ غُلَامُ اَحْمَدَ الْقَادِيَانِىْ وَرَشِيْدُ اَحْمَدُ وَمَنْ تَبِعَهٗ كَخَلِيْلِ اَحْمَدَ الْاَنْبِهَٹِىْ وَاَشْرَفُ عَلِىْ وَغَيْرِهِمْ - لَاشُبْهَةَ فِىْ كُفْرِهِمْ - بِلَا مَجَالٍ بِلَا شُبْهَةٍ فِىْ كُفْرِ مَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهِمْ بِحَالٍ مِّنَ الْاَحْوَالِ-

অর্থাৎ ঃ "প্রশ্নে বর্ণিত এসব লোক যেমন-গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, তার অনুসারী খলিল আহমদ আম্বেটী ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশ্রাফ আলী খানবী প্রমুখের কুফরীতে কোন সন্দেহ নেই। যারা তাদের কুফরীর ব্যাপারে যেকোন ভাবে সন্দেহ পোষন করবে-তারাও নিঃসন্দেহে কাফের"। (হোসসামুল হারামাঈন)।

হোসসামুল হারামাঈন গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে- "নবুয়তের ভন্ড দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দ্বীন হতে খারিজ এবং আল্লাহর উলুহিয়াত এবং রাসুলের রিসালাতের শান-মান খর্বকারী। কাছেম নানুতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমদ আম্বেটি, আশরাফ আলী থানবী-এরা প্রত্যেকেই (কুফরী আক্বিদা পোষণ করার কারণে) কাফের ও মুরতাদ এবং দ্বীন ইসলাম হতে খারিজ। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে"। (হোসসামুল হারামাঈন)।

"বাজজাজিয়া, দোরার ও গোরার, ফতোয়ায়ে খাইরিয়া, আনূহুর, দুররে মোখতার-প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যক্তিদের ন্যায় অন্যান্য প্রকাশ্য কাফেরদের বেলায় বলা হয়েছে-

وَمَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهِمْ فَقَدْ كَفَرَ-

অর্থাৎঃ "যারা এ ধরণের লোকদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করবে-তারা অবশ্যই কাফের"। (দোররে মোখতার)।

বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "যারা বাতিলপন্থীদের বদ আক্বিদাকে প্রশংসা করবে অথবা বলবে-এর ভিন্নার্থ আছে, অথবা বলবে-এর বিশুদ্ধ অর্থ আছে, এমতাবস্থায় সেও কাফের বলে গণ্য হবে"। (বাহরুর রায়েক)।

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ) তাঁর "কিতাবুল এ'লাম" এর মধ্যে বলেছেন- "যে মুসলমান কুফরী কথা বলে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি ঐ কথায় সায় দেয়, সেও কাফের"। (কিতাবুল এ'লাম)।

(প্রশ্নকারী বলেন-) "মক্কা-মদিনার ৩৩ জন মুফতির ফতোয়া অনুযায়ী এবং হোসসামুল হারামাঈন -এর ভাষ্যমতে নজীর হোসাইন দেহলভী (আহ্‌লে হাদীস), কাছেম নানুতুবী, মির্জা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেটি, আশ্রাফ আলী থানবী এবং তাদের অনুসারী সবাইকে যারা কাফের মনে না করবে, তাদের কুফরীতেও কোন সন্দেহ নেই- মুরব্বী ও নেতা "হওয়াতো অনেক দূরের ব্যাপার"।

(প্রশ্নকারী বলেন-) আমি সংক্ষেপে তাদের কথা বললাম। তাদের বিস্তারিত কুফরী আকিদা বর্ণনা করিনি। যাদের মনে চায়, হোসসামুল হারামাঈন ও ফতোয়াউল হারামাঈন পাঠ করা উচিত।

প্রশ্নকারীঃ যিয়াউদ্দীন মক্কী।

জওয়াব ঃ প্রশ্নকারী অকাট্য দলিল সমূহ উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছেন। এই অকাট্য দলিল মৌজুদ থাকতে অন্যান্য খুটিনাটি ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। হারামাঈন শরিফাঈন-এর মুফতীগন নানুতবী, গাঙ্গুহী-গংদের নাম ধরে বলেছেন-"এরা কাফের"। সুতরাং যারা তাদেরকে পেশোয়া ও সুন্নী মুসলমান মনে করবে- তারাও কাফের। প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীস সমূহ হচ্ছে এর দলীল। এমন লোকদের থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের মতবাদ খন্ডন করা ফরয। তাদের সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়া হারাম ও ইসলাম ধ্বংস করার শামিল। তাদেরকে সালাম দেওয়া হারাম, তাদের মজলিসে বসা হারাম, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করা হারাম, তাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক করা হারাম, অসুখ হলে সেবা করা হারাম, মরে গেলে জানাযায় শরিক হওয়া হারাম, তাদের জন্য শোকবাণী দেওয়া হারাম, তাদের কবর যিয়ারত করা হারাম, তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হারাম, তাদের জন্য ইছালে সওয়াব করা হারাম-বরং কুফর"।

-ইমাম আহমদ রেযা।

(নোটঃ ঐসব লোকদের এদেশীয় অনুসারীদের বেলায়ও একই ফতোয়া প্রযোজ্য- অনুবাদক)।

ছাওয়াল-৩৩ ঃ হুযুরের (আ'লা হযরত) জওয়াব ও হারামাঈন শরিফাঈন-এর মুফতীগণের ফতোয়া দ্বারা বুঝা গেল-তারা পরিস্কার কাফের ও মুরতাদ। তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক রাখা হারাম। তাহলে বুঝা গেলো- মুসলমানের মসজিদে যাওয়ার কোন অধিকারও তাদের নেই। কেননা, ইবনে হিব্বান বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে-

وَلَاتُصَلُّوْا مَعَهُمْ "তাদের সাথে নামায পড়ো না"। তাদের সাথে কাতারে দাঁড়ালে তো কাতার শুদ্ধ হবে না-কাতার ফাঁকা বলে গণ্য হবে। হাদীসে আছে-"যারা কাতার কর্তন করে, আল্লাহ তাদের কর্তন করে দেন"।

মুসলমানদের মধ্যে যদি প্রভাবশালী লোক থাকে এবং ফাসাদ ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাঙ্গামা হওয়ার আশংকা না থাকে, তা হলে তার উপর ফরয হলো- এদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা এবং অন্য লোকের নামায নষ্ট হতে না দেওয়া। শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বাধা না দিলে আল্লাহর নিকট দায়ী এবং আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

দেখুন-দাউদ আলাইহিস সালামের উম্মতের মধ্যে একদল লোক নবীর হুকুম অমান্য করে শনিবারে মাছ শিকার করতো এবং আরেক দল তাদেরকে বারণ করতো। তৃতীয় দল কিছু বলতো না। তারা সাতে-পাঁচে ছিল না- বরং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতো। আল্লাহপাক ঐ নাফরমান মাছ শিকারী এবং নিরপেক্ষ লোকগুলোকে বানরে রূপান্তরিত করে তিনদিন পর ধ্বংস করে দেন। অদ্রুপ, যেসব লোক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এসব বাতিলপন্থীদের প্রতিরোধ করে না- বরং চুপ থাকে বা নিরব ভূমিকা পালন করে, তারাও ওদের মতই কাফের বলে গণ্য হবে। কেননা, কাফেরদের কুফরীতে সাহায্য করা বা চুপ থাকা আরেক কুফরী। হুযুর মেহেরবানী করে এব্যাপারে আপন মতামত ব্যক্ত করুন। **(যিয়াউদ্দীন মক্কী)।**

জওয়াবঃ ৩২ নং প্রশ্নের জবাবেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, এদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা ফরযে আইন। মক্কা-মদিনার মুফতীগণের ফতোয়া মোতাবেক কাছেম নানুতবী, গাঙ্গুহী, থানবী, আম্বেটি-প্রমূখ নেতাগণ কাফের ও মুরতাদ বলে ঘোষিত হয়েছে। এখন তাদের আকিদায় বিশ্বাসী অনুসারীদের বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং মুসলমানের মসজিদে আসার আইনগত কোন অধিকারই তাদের নেই। ইবনে হিব্বানের রেওয়ায়াতকৃত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন وَلَاتَصَلُّوْا مَعَهُمْ "অর্থাৎ ঃ (গাঙ্গুহী, থানবীর অনুসারী) বাতিলপন্থীদের সাথে নামাযও পড়ো না"। তাহলে তাদের নামাযের স্থানটি খালি বলে গন্য হবে। কাতার কর্তন করা হাদীস মোতাবেক হারাম। সুতরাং কোন বাতিলপন্থী নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলে সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর কর্তব্য হবে, গন্ডগোল না করে শুধু প্রভাবের দ্বারা তাকে কাতার থেকে বের করে দেওয়া এবং মসজিদে আসতে না দেওয়া-যাতে অন্যান্য মুসল্লীদের নামায বিশুদ্ধ কাতারের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়। **(এটা তখনই করবে- যখন ফিতনা ফাসাদের আশংকা না থাকে- এম.এ. জলিল)।**

আপনার (যিয়াউদ্দীন মক্কী) প্রশ্নের মধ্যেই বলা হয়েছে-হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিষেধ উপেক্ষা করে একদল লোক শনিবারে মাছ শিকার করতো। আর একদল নিরপেক্ষ ছিল। তৃতীয় দল শক্তি দিয়ে নিষেধ করতো। আল্লাহ্ প্রথম দুই দলকে বানরে রূপান্তর করে তিনদিন পর তাদেরকে হালাক করে দিয়েছেন। নিষেধকারীরা নাজাত পেয়েছে। বাতিল-পন্থীদের বেলায়ও তদ্রুপ। যারা গাঙ্গুহী ও থানবীর কুফরী মতবাদ অনুসরণ করবে এবং যারা তাদেরকে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বাধা দেবে না-তারা উভয়েই আল্লাহ্র শাস্তিযোগ্য কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। যারা সামর্থানুযায়ী বাধা দেবে- তারাই কেবল ঐ শাস্তি ও কঠিন শরয়ী বিধান থেকে রক্ষা পাবে।

ছাওয়াল-৩৪ ঃ বর্তমান সময় ইসলামের নবীর উপর বাতিলপন্থীদের চতুর্মূখী আক্রমন চলছে। নবীজীর মর্যাদায় আঘাত হানা হচ্ছে। ইসলাম বিকৃতকারীরা বিদেশী প্রভূদের অর্থে খুবই শক্তিশালী ও মারমূখী হয়ে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত-এর উপর কি ফরয নয় যে, তারা প্রকৃত ইসলামী ব্যাখ্যা ও বিশুদ্ধ এলেম জনগনের কাছে তুলে ধরুক? লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মাঠে নেমে আসা কি তাদের ফরয নয়? সুন্নাতকে পূনর্জীবিত করা এবং বিদআতী আকিদা খতম করা কি তাদের কর্তব্য নয়? যদি তারা তা না করেন, তাহলে শাস্তির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে কি না? যেমন-আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (৯৭৪হিঃ) তাঁর লিখিত "আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা" গ্রন্থে একখানা হাদীস উল্লেখ করেছেন। ঐ হাদীসখানা খতীবে বাগদাদী (রাহঃ) তাঁর "আল-জামে" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস খানা হলো-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ اَوْقَالَ الْبِدَعُ وَسَبَّ اَصْحَابِيْ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَايَقْبَلُ اللّٰهُ لَهُ عَدْلًا -

অর্থাৎ ঃ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যখন ধর্মীয় ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং বিদআতী

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বিদার প্রসার ঘটবে, আমার সাহাবীদেরকে গালি গালাজ করবে এবং সমালোচনা করতে থাকবে-তখন প্রকৃত সুন্নী আক্বিদাপন্থী আলেমদের উপর সত্য প্রকাশ করা ফরয হয়ে পড়বে। যদি তারা তা না করেন, তাহলে এই সুন্নী আলেমদের উপর আল্লাহ, ফিরিস্তা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ একসাথে নেমে আসবে। তাদের ফরয ও নফল কিছুই কবুল হবে না"। (খতীবে বাগদাদীর "আল জামে" এবং ইবনে হাজর মক্কীর "আস সাওয়াইকুল মুহরিকা")।

জওয়াব ঃ বিদআতপন্থীদের বাতিল আক্বিদার প্রসারকালে সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে জেহাদ করা, নতুন বিদআতকে প্রতিরোধ করা, মৃত সুন্নাতকে পূণর্জীবিত করা প্রত্যেক সুন্নী আলেমের উপর ফরযে আযম। **শক্তি থাকলে ঈমান ধ্বংসকারী ও অনিষ্টকারীকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া ওয়াজিব।** ইসলামের অনিষ্ট হচ্ছে বড় অনিষ্ট। যারা মুখে ও লিখনীতে ইসলামের ক্ষতি করে, প্রশ্নকারীর উল্লেখিত হাদীস মোতাবেক তারাই ঈমান ধ্বংসকারী ও অনিষ্টকারী। (ফকির আহমদ রেযা কাদেরী আবদুল মোস্তফা আহমদ রেযা- মুহাম্মদী, সুন্নী, হানাফী, ক্বাদেরী।)

[বিঃ দ্রঃ ৩১ হতে ৩৪ পর্যন্ত প্রশ্নকর্তা যিনি- তিনি একজন বিশেষজ্ঞ আলেম এবং মুফতী। তার প্রশ্নের মধ্যেই জবাবের সমাধান হয়েছে। তবুও আ'লা হযরতের জবাবই ফতোয়া হিসাবে গন্য- অনুবাদক]

ছাওয়াল-৩৫ ঃ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তির দাবী হলো- কোরবানী ও আক্বিক্বার পশুর চামড়া মসজিদ ও মাদ্রাসার কাজে খরচ করা যাবে- কেননা ইহা শুধু কুরবত বা আল্লাহ্র ওয়াস্তে যবেহকৃত। কিন্তু বকর নামক অপর ব্যক্তি আপত্তি করে বলছে- না, মসজিদ মাদ্রাসার কাজে লাগানো যাবে না। ফকিরকে দান করতে হবে। ফকির মিছকিনগণ যেকোন সৎকাজে তা ব্যয় করতে পারবে। কেননা, ইহা সদকা স্বরূপ এবং সদকা ও যাকাতের মালিক ফকির মিসকিনসহ আট প্রকারের লোক- যা সূরা তাওবায় বর্ণিত হয়েছে। (বকর বলছে)- যায়েদের দাবীর স্বপক্ষে কি কোন দলীল আছে? যদি থাকে, তাহলে তা কী? আশা করি দলীল উল্লেখ করে এই বিতর্কের সমাধান দিবেন।

জওয়াব ঃ যায়েদের কথাই সত্য। মসজিদ মাদ্রাসায় কোরবানী ও আকিকার চামড়া খরচ করা যাবে। বকরের দলীল সঠিক নয়। কারণ,

সূরা তাওবার আয়াতের অর্থ হচ্ছে যাকাত। যাকাতের মালের সরাসরি হকদার হচ্ছে ফকির মিসকিন ইত্যাদি। চামড়া তো যাকাত নয়-বরং গরুর অংশ। মালিক ইচ্ছা করলে নিজেই চামড়া ব্যবহার করতে পারবে বা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারবে। এটাকে যাকাতের মত ওয়জিব সদকা মনে করা ভুল। বকর সেই ভুলই করেছে। এটা কি করে সম্ভব যে, মালিক নিজের কোরবানী ও আকিকার গোশ্ত খেতে পারবে- কিন্তু চামড়া ব্যবহার করতে পারবেনা? গোটা পশুর যে কোন অংশ নিজে ব্যবহার করতে পারবে, বন্ধুবান্ধব সকলকে দান করতে পারবে এবং ফকির মিছকিনকেও খাওয়াতে পারবে। এতে কোন বাধা নেই।

হ্যাঁ, যদি এমনিতেই গোস্ত চামড়া বিক্রি করে, তাহলে ফকির মিছকিনের হক হবে- অন্য কেউ ভোগ করতে পারবেনা। কিন্তু বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় দান করার নিয়তে বিক্রি করলে ঐ টাকা মসজিদ বা মাদ্রাসায়ও লাগানো যাবে। যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার হুকুম এক নয়। ইমাম জায়লায়ী "শরহে কানযুদ দাকায়েক" গ্রন্থে বলেছেন-

لِاَنَّهٗ قُرْبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ-

অর্থাৎ -"কোরবানী ও আকিকা হচ্ছে নফল সদকার মতই কুরবত (সওয়াব)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا-

অর্থাৎ ঃ "কোরবানীর গোশত নিজেরা খাও, জমা করে রাখতে পারো এবং সাওয়াবের কাজেও লাগাতে পারো"।

(সূত্র ঃ হযরত নুবাইশাতা হোযালী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- যা আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত)।

সুতরাং কোরবানীর চামড়া সুন্নী মসজিদ, মাদ্রাসা ও ব্যক্তিকে দান করা সাওয়াবের কাজের মধ্যেই গণ্য।

হ্যাঁ, কেউ যদি নিজে খরচ করার উদ্দেশ্যে চামড়া বিক্রি করে, তাহলে নিজে তা খরচ করতে পারবেনা। তখন শুধু ফকির মিছকিনের হক হয়ে যাবে এবং তার নিজ স্বত্ব রহিত হয়ে যাবে। দলীল-

لِاَنَّهٗ خَرَجَ مِنَ التَّمَوُّلِ كَمَا نَصُّوْا عَلَيْهِ وَفِىْ حَدِيْثِ الْمُسْتَدْرَكِ مَنْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَاعَ جِلْدَالْاُضْحِيَّةِ فَلَا يُصْرَفُ عَلَى الْمَسْجِدِاَوِالْمَدْرَسَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ بَلْ يُصْرَفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ۔
كَمَا هُوَحُكْمُ الْمَالِ الْخَبِيْثِ۔

অর্থ ঃ "কোরবানী ও আক্বিক্বার পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ তার স্বত্ব নয়- বরং তার স্বত্ব রহিত হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরামের ইহাই অভিমত এবং তাঁরা মোস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসকে তাঁদের দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। মোস্তাদরাকে আছে-"যে ব্যক্তি কোরবানীর চামড়া (বিনা নিয়তে) বিক্রি করবে, তা মসজিদ মাদ্রাসায় খরচ করা যাবেনা। আল্লাহ্ হচ্ছেন পবিত্র; (মসজিদ মাদ্রাসার) দান হিসাবে একমাত্র পবিত্র জিনিসকেই তিনি কবুল করেন। সুতরাং এমতাবস্থায় তা শুধু ফকির-মিছকিনকেই দান করতে হবে। কেননা ইহা মালে খবিছ বা অপবিত্র হিসাবে গন্য"। (মোসতাদরাক)।

আর যদি মসজিদ বা মাদ্রাসা অথবা ফকির মিসকিনকে দান করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করে, তাহলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও ফকির মিছকিন- সকলকেই দান করতে পারবে। এমনকি, মসজিদ বা মাদ্রাসার পক্ষে মোতাওয়াল্লী বা সভাপতি তা গ্রহণ করতে পারবেন।

মূল সূত্র হলো " اَلتَّمَوُّلُ مَمْنُوْعٌ لَاالتَّقَرُّبُ "

অর্থাৎ "কোরবানীর চামড়ার বিক্রিত অর্থের মালিক নিজে হওয়া নিষেধ- কিন্তু সাওয়াব অর্জন করা নিষেধ নয়"।

ইহার পূর্ণ ও বিস্তারিত তাহক্বীক্ব এবং বিচার বিশ্লেষণ আমার রচিত (আ'লা হযরত) গ্রন্থ "আস সাফিয়া ফী হুকমি জুলুদিল উদ্হিয়া" দেখুন।

ফকির আহমদ রেযা উফিয়া আনহু
আবদুল মোস্তফা আহমদ রেযা
মোহাম্মদী, সুন্নী, হানাফী, ক্বাদেরী।

ছাওয়াল- ৩৬ ঃ কাওয়ালগণ যে পদ্ধতিতে কাওয়ালী পরিবেশন করে, ঐভাবে কেউ যদি গজল, হামদ, না'ত অথবা বুযর্গানে দ্বীনের শানে মুর্শিদী পরিবেশন করে এবং কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে-তাহলে তা শুনতে শরয়ী কোন বিধি নিষেধ আছে কি?

জওয়াব ঃ বাদ্যযন্ত্র বিহীন গজল, হামদ, না'ত ও মুর্শিদী- ইত্যাদি

কাওয়ালী নিয়মে পরিবেশন করাতে কোন দোষ নেই। তবে হিজড়া, মহিলা- ইত্যাদি দ্বারা নয় এবং মহিলা শ্রোতা যদি মজলিসে উপস্থিত না থাকে এবং শরিয়ত পরিপন্থী কোন অবস্থা সৃষ্টির আশংকা না থাকে- তাহলেই কাওয়ালীর রীতিতে বাদ্যবিহীন এসব পরিবেশন করা যাবে। -আহমদ রেযা বেরলভী।

ছাওয়াল-৩৭ ঃ বর্তমানকালে জামা ও সদরিয়ায় (কুটি) চান্দীর বুতাম লাগানো হয় এবং চিকন চান্দীর চেইন দিয়ে তা গেথে রাখা হয়। এধরনের চেইনযুক্ত বুতাম লাগানো জায়েয কিনা? এক ব্যক্তি বলছেন- রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর জনৈক দাওরা পাশ ছাত্র নাকি বলেছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার মধ্যে গলার নিকটে চান্দীর গুটলী বসাতেন। এর উপর ভিত্তি করে সে রূপার বুতাম চেইন সহ ব্যবহার করা জায়েয বলে মন্তব্য করেছে। এর সঠিক বর্ণনা করুন। (মির্জা গোলাম কাদির বেগ, মিরেট ১২ রমযান ১৩০৭ হিজরী।)

জওয়াব ঃ রূপা বা চান্দীর শুধু বুতাম লাগালে জায়েয হবে। (কিন্তু চেইন জায়েয নয়)। ফিকাহ্র কিতাব সমূহে জামায় স্বর্ণের গুটলী বা বুতাম ব্যবহারের অনুমতির উল্লেখ রয়েছে- কিন্তু চেইনের উল্লেখ নেই।

যেমন-দুররে মুখতারে উল্লেখ আছে- "ছায়রে কবির গ্রন্থের সূত্রে তাতারখানীয়াতে উল্লেখ আছে যে, لَابَاْسَ بِاِزْرَارِالدِّيْبَاجِ وَالذَّهَبِ۔

অর্থাৎ ঃ "স্বর্ণের বা রেশমের গুটলী জামার কলারে ব্যবহারে কোন দোষ নেই।" গুটলী ও বুতাম একই জিনিস-পার্থক্য শুধু আকারে। স্বর্ণের বুতাম জায়েয হলে রূপার বুতাম তো বিনা প্রশ্নেই জায়েয হবে। সুতরাং স্বর্ণ ও চান্দির বুতাম লাগানো জায়েয।

বাকী রইলো বুতামের সাথে রূপার চেইন লাগানোর বিষয়টি। ইমামগণের পরিষ্কার মন্তব্য পাওয়া না গেলে নিজে নিজে দূঃসাহস করা ঠিক হবেনা। কেননা, পুরুষের বেলায় বুতাম ও আংটি ছাড়া সোনা-রূপা ব্যবহার করা হারাম। চান্দির বুতামের ক্ষেত্রে ইমামগণের জায়েয মতামত পাওয়া যায়- কিন্তু শিকল বা চেইনের বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) "আশিয়াতুল লুমুয়াত শরহে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিশকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "শরিয়ত স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবহার (পুরুষের উপর) হারাম ঘোষনা করেছে এবং পূর্বের মোবাহকে রহিত করে দিয়েছে। তাই পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার- মূলতঃই হারাম হয়ে গেলো।

এখন চেইন হালাল প্রমান করতে হলে খাস দলীলের প্রয়োজন হবে। শিকল বা চেইনের ব্যাপারে অনুমতি সূচক কোন স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়না। চেইন হারাম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো- এইভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আংটি ও বুতাম ব্যতিত রূপার ব্যবহার পুরুষদের জন্যও জায়েয নয়। তাই তানভীরুল আবছার গ্রন্থে ফতোয়া দেয়া হয়েছে-

لَا يَتَحَلَّى الرَّجُلُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ اِلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ وَمِلْيَلَةِ سَيْفٍ مِنْهَا-

অর্থাৎ ঃ "পুরুষ লোকদের জন্য আংটি, কোমরবন্দ ও তলোয়ারের বাঁট ব্যতিত সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার করা জায়েয নয়"। (তানভীরুল আবছার)

ফতোয়ায় বুতামের চেইনের যেহেতু উল্লেখ নেই- তাই অনুমতিও নেই।

কেউ যদি বলে "রূপার বুতাম যদি জায়েয হয়, তাহলে তার সংযুক্তকারী চেইন নাজায়েয হবে কেন"? উপরের দলীলে তাদের এই প্রশ্ন অবান্তর প্রমাণিত হয়ছে। চেইন বুতামের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী পায়জামা পরিধান করার জন্য রেশমের কোমরবন্ধ বা তাগাও জায়েয নয়- কেননা, ইহা পায়জামার অবিচ্ছেদ্য ও জরুরী অংশ নয়।

দুররে মোখতারে উল্লেখ আছে- وَقَوْلُهُ لَا يَتَحَلَّى اَىْ لَا يَتَزَيَّنُ-

অর্থাৎ ঃ "চান্দি বা আংটি ও তলোয়ারের বাঁট ব্যতিত স্বর্ণ ও রূপা পুরুষগণ ব্যবহার করবেনা"-একথার অর্থ হলো- সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ইহা মাকরুহে তাহ্‌রীমী। সুতরাং রূপার চেইন ব্যবহার করাও মাকরুহে তাহ্‌রীমী।

দেখুন! রেশমের তাগা যদি পায়জামার অবিচ্ছেদ্য অংশ না হয়, তাহলে রূপার চেইন কি করে বুতামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে? যদি

চেইন জায়েয হতো, তাহলে অন্যান্য রূপার গহনাও জায়েয হতো। স্বর্ণ বা রূপার চেইন জায়েয হওয়ার কোন স্পষ্ট দলীল ফেকাহ্‌ গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছেনা।

গলার কাছে রূপার গুটলী ব্যবহারের কথা হাদীস বা কোন কিতাবে আমি দেখিনি বা মনেও পড়েনা। তবে, হাদীসে এরূপ আছে- **"রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জুব্বা মোবারক পরিধান করতেন, তার গলা, আস্তিন ও ঘেরাও রেশমের সূতা দ্বারা নকশী করা ছিল"-গুটলী নয়।** (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বুখারীর আদাবে মুফরাদ, মুসলিম, আবু দাউদ)।

সুতরাং রেশমী সুতার সেলাই জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা। রূপার চেইন জামার বুতামে ব্যবহারের প্রমাণ দেওয়া তারই দায়িত্ব- যিনি দাবী করেছেন। ইমাম তাহাভী এবং শামী বলেছেন- **"রেশমী সুতা দ্বারা সেলাই করা জুব্বা মোবারকে গুটলী ছিল রেশমের। স্বর্ণ বা রৌপ্যের কথা সেখানে উল্লেখ নেই"।**

(২য় খণ্ড অনুবাদ সমাপ্তঃ ২৬ মে' ০৫)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

ইরফানে শরিয়ত

৩য় খণ্ড

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাঃ)

ছাওয়াল-০১ ঃ কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া, কবরের মাটি সমান হয়ে গেলে তার উপর মসজিদ তৈরী করা, কবরকে খেত খামারে পরিণত করা বা তাতে ফুলের বাগান করা- ইত্যাদি জায়েয আছে কিনা?

জওয়াব ঃ কবরের উপর নামায পড়া হারাম। খোলা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়াও হারাম, কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখাও হারাম।

সরাসরি কবরের মাটির উপর মসজিদ তৈরী করা হারাম। ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে- تُكْرَهُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ وَاِلَيْهِ لِوُرُوْدِ النَّهْىِ -

অর্থঃ "কবরের উপর এবং (উন্মুক্ত) কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া হারাম। কেননা, এ ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে"। (শামী)।

মসজিদের ভিতরে যদি কবর পড়ে যায়, তাহলে চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখবে-যদিও তা হাটু বরাবরই হোকনা কেন। **কবরের মাটি হতে হাঁটু বরাবর উপরে পিলার দিয়ে তার উপর মসজিদ তৈরী করলে নামায জায়েয হবে।** কেননা, এতে আর সরাসরি কবরের মাটির উপর পা রাখা বা নামায পড়া হবে না-বরং মেঝের উপর হবে। এমতাবস্থায় কবরের দিকেও মুখ হবেনা।

ছাওয়াল-০২ ঃ গরম পানি ঢেলে ছারপোকা মারা জায়েয আছে কিনা? কেননা, হাদীসে এসেছে-"আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হারাম"। কিন্তু হাদিসে গরম পানির উল্লেখ নেই। তাই এরূপ করা জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ আগুন বা গরম পানি ছাড়া অন্য উপায়ে ছারপোকা ধ্বংস করা উত্তম। তবে পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব না হলে গরম পানি ব্যবহার করাতে ক্ষতি নেই।

ছাওয়াল-০৩ ঃ দ্বীনী মাদ্রাসার জন্য কাফেরদের নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা তাদেরকে সাহায্য করা জায়েয কিনা?

জওয়াবঃ ধর্মীয় কাজে কাফের বা অমুসলিমদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ। রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- اِنَّالَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ-

অর্থাৎ ঃ "আমরা মুশরিকদের কাছে সাহায্য চাইবো না"।

আর তারা যদি সেচ্ছায় দান করতে চায় এবং এতে মুসলমানের উপর তাদের অনুগ্রহ মনে করে, তাহলেও জায়েয হবেনা। তবে, যদি ভক্তি করে খেদমত করার উদ্দেশ্যে দেয়, তাহলে নেয়া জায়েয হবে-তবে না নেওয়াই উত্তম। (কাফেরদের ধর্মীয় কাজে স্বেচ্ছায় সাহায্য করাও হারাম-জলিল)।

ছাওয়াল-০৪ ঃ হিন্দুস্তানের লাক্ষ্মৌ, পাটনা, আজিমাবাদ-ইত্যাদি শহরের বাসিন্দারা পেশাব করে কুলুখ ব্যবহার করেনা-শুধু পানি দ্বারা পরিষ্কার করে। এতে কি তাদের লুঙ্গি বা পায়জামা নাপাক বলে গন্য হবে? যদি তাই হয়-তাহলে তাদের নামায শুদ্ধ হবে কিনা? তিনি যদি ইমাম হন-তাহলে কি হবে? কিছু লোকের ধারণা-পানি ব্যবহার করলে পেশাবের ফোঁটা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের এই ধারণা কি সঠিক-নাকি শুধুই ধারণা?

জওয়াবঃ কুলুখ এবং পানি-উভয়টি ব্যবহার করাই উত্তম। তবে কুলুখ অথবা পানি-যে কোন একটি ব্যবহার করলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে সর্বোত্তম হলো কুলুখ ও পানি উভয়ই ব্যবহার করা। তারপর শুধু পানি, তারপর শুধু কুলুখ। শুধু পানি বা কুলুখ ব্যবহার করলে এবং পেশাব বের না হলে কাপড় নাপাক বলে গন্য হবে না। তার নামায বা ইমামতিতেও কোন ত্রুটি হবে না। (হিল্‌ইয়া ও শামী)। (মূল কথা হলো-পাক হওয়া ওয়াজিব- জলিল)।

পানি মূলতঃ ঠান্ডা। তাই পেশাবের ফোঁটা বন্ধ করতে ইহা খুবই সহায়ক। অনিচ্ছায় পুরুষের মজি বের হলে গোসল না করে শুধু লিঙ্গ ধুয়ে ফেলা উলামাগনের মতে জায়েয হওয়ার ইহাই (পেশাব বন্ধ) মূল কারণ। ইমাম তাহাভী (রাঃ) 'শরহে মাআনিউল আছার' গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। লিঙ্গ ঠান্ডা থাকলে মজি অথবা পেশাবের ফোঁটা বন্ধ থাকার জন্য সহায়ক হয়। (মোট কথা-পেশাব বন্ধ হওয়া সম্পর্কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিশ্চিত হতে হবে-অনুবাদক)

ছাওয়াল-০৫ ঃ আজকাল মহিলারা গায়রে মুহরিম বা পর পুরুষের সামনে যেতে মোটেই ইতস্ততঃ করছেনা। খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাইদের সামনে বিনা পর্দায় দেখা সাক্ষাত করছে। মাথায় কাপড় বা ওড়না থাকছেনা। যদিও থাকে-তা এত পাতলা যে, নীচের চুল ও খোপা পরিস্কার দেখা যায়। পরনে এমন ধরনের কাপড় জড়াচ্ছে, যার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যাচ্ছে। মহিলার স্বামী বা ঘরের কেউ বাধা দিচ্ছেনা-বরং স্বামীর দুর সম্পর্কীয় বন্ধু-বান্ধবের সামনে না আসলে স্ত্রীকে ভৎর্সনা করা হয়। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো বৈধ কিনা এবং শরিয়তের মতে এমন স্বামীর হুকুম কি?

জওয়াব ঃ মহিলা যদি এমন অবস্থায় গায়রে মুহরিম বা পর পুরুষের সামনে আসে যে-তার চুল, পেট, গর্দান, গলা, পায়ের হাটুর নিচের অংশ দেখা যায়, অথবা সরু কাপড়ের নীচে শরীরের অংশ প্রকাশ পায়-তাহলে শরিয়তে ঐরূপ করা হারাম এবং মহিলাকে ফাসেকা নামে অভিহিত করা হবে। তার স্বামী যদি এতে রাজি থাকে অথবা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে বারন না করে, তাহলে তাকে বলা হয় "দাইয়ুছ"। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবেনা। বানালে গুনাহ্ হবে।

আর যদি মহিলার সর্বাঙ্গ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত মোটা কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখের টিকলী খোলা থাকে, কান ও কপালের চুল এবং চিবুক খোলা থাকে-এমতাবস্থায়ও সামনে যেতে শরিয়তের নিষেধ রয়েছে। অর্থাৎ শরীর ও মুখ ঢেকেই দেখা করতে পারবে। শরিয়ত বিরোধী কাজে যদি স্বামীর সায় থাকে-তাহলে তাকে ইমাম না বানানোই উত্তম। কেননা, ফিতনার পথ বন্ধ করা শরীয়ত মতে ওয়াজিব।

ছাওয়াল-০৬ ঃ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তির বয়স ৭০ বৎসর। সে অসুস্থ এবং শরীরে কম্পন আছে। একাকী সফর করতে অপারগ। সুস্থ ও যৌবনকালে সে এরূপ সম্পদের মালিক ছিলোনা-যাতে হজ্ব ফরয হতে পারে। বৃদ্ধকালে এসে বাড়ীও জায়গা-জমীন বিক্রি করে সে মোট পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করেছে। ইহাই তার মূলধন। তিনি

বৃদ্ধাবস্থায় অন্য শহরে আত্মীয় স্বজনের নিকট থাকার মানসে সেখানে বাড়ী কিনতে চায়। এমতাবস্থায় তার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে হজ্বে বদল করাতে পারবে কিনা?

জওয়াব ঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় হজ্বে বদলও ওয়াজিব হবে না। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর যাহিরুর রিওয়ায়াত মোতাবেক বিশুদ্ধ মত হলো-"সম্পদের সাথে যদি হজ্বে যাওয়ার মতো সুস্থতা থাকে, তাহলেই হজ্ব ফরয হবে-নতুবা নয়"।

ইমামে আযমের (রহঃ) মতে শুধু অর্থ ও সুস্থতাই হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য একমাত্র শর্ত নয়- বরং আসা যাওয়ার সুব্যবস্থা থাকা বা বাধা না থাকাও শর্ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় বাদ দিয়ে অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই ঐ সব শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে হজ্ব ফরয হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ)-এর মতে "অসুস্থ হলেও হজ্ব ফরয হবে-তবে নিজে আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়-বরং অন্যকে দিয়ে হজ্বে বদল করাতে হবে"।

এই বৃদ্ধের বেলায় বাড়ীটি হলো তার মূল বা নিত্যপ্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে এখন হজ্ব করাও সম্ভব নয়। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যায় -এই বৃদ্ধের উপর হজ্ব ফরযই হয়নি। সুতরাং হজ্বে বদলের প্রশ্নই উঠেনা।

আল্লাহ্পাক বলেন-"সাধ্যের বাইরে আল্লাহ্ কাউকে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" (সুরা বাক্বারা); (তানভিরুল আবছার, দুররে মোখতার, বাহরুল রায়েক, ফতহুল ক্বাদির)।

ছাওয়াল-০৭ ঃ যায়েদ নামক এক ব্যক্তি নিজে দ্বীনী মৌলিক বিষয় সমূহ মানেন এবং অমান্যকারী ও অস্বীকারকারীকে কাফের এবং মুরতাদ বলে স্বীকারও করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা)-এর বেলায় একথা বলেন-"যদিও তিনি নবীদের পরেই সমগ্র মানব জাতি হতে উত্তম-কিন্তু ইমাম হাসান-হোসাইনের চেয়ে উত্তম নন"। তিনি আরো বলেন-"সমগ্র মানব জাতি হতে নবীদের পরে আবু বকর উত্তম"- উক্ত হাদীসের এই আম শব্দ হতে ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) বাদ-কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীন থেকেও উত্তম বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-"তাঁরা বেহেস্তী

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুবকদের সর্দার"।

জওয়াব ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের ফযিলত ও মর্যাদা হলো সার্বিক বিবেচনায়। কিন্তু যায়েদ তার অজ্ঞতা অথবা অন্ধ মহব্বতের কারনে হুযুর (দঃ)-এর উভয় নাতীকেও সার্বিক মর্যাদা দিয়েছেন এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) সার্বিক মর্যাদাকে অস্বীকার করেছেন। এমনকি-সে হযরত আলী (রাঃ)-এর চেয়েও তাঁদের দুইজনকে বড় বলছে। তার এই অন্ধ ধারণা আহ্লে সুন্নাতের খেলাফ এবং বাতিল-এতে সন্দেহ নেই। যায়েদ তওবা না করলে খাটি সুন্নী বলে গণ্য হবে না। তার খোড়া দলীল অগ্রহণীয়।

যদি আল্লাহ্র নিকট দুই ভাইয়ের সম্মান হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর চেয়ে বেশী হতো, তাহলে তো আজকালের মীর বংশীয় লোকেরাও (সাইয়েদ ও হাসান হোসেনের বংশধর হিসাবে) হযরত আলীর চেয়েও উত্তম হতো-যদিও তারা বেশুমার গুনাহ্গারই হোকনা কেন?

এমন কথা একমাত্র গোমরাহ ও গোমরাহকারী লোকেরাই বলতে পারে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "জ্ঞানী আর মুর্খ কি এক সমান"? আরও এরশাদ করেন-"য়ারা ইমানদার ও জ্ঞানী-তাদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে"।

এতে বুঝা যাচ্ছে-বংশীয় মর্যাদার চেয়েও এলেমের মর্যাদা অনেক বড়। এই বংশীয় "মীর সাহেব" আলেম নন-বরং একজন নেককার ব্যক্তি। আজকাল তো এরা সুন্নী আলেমের মর্যাদায়ও পৌছাতে অক্ষম। ইমাম, সাহাবী, মাওলা আলী (রাঃ), সিদ্দীক ও ফারুক-এর মর্যাদায় পৌছার তো প্রশ্নই আসেনা। "তানভীরুল আবছার" গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

لِلْعَالِمِ الشَّارِبِ اَنْ يُّتَقَدَّمَ عَلَى الشَّيْخِ الْجَاهِلِ وَلَوْقُرَيْشِيًّا-

অর্থাৎ ঃ "সামান্য লেখাপড়া জানা মূর্খ শেখের চেয়ে শরাবখোর আলেম অগ্রগন্য-যদিও ঐ শেখ কোরাইশ বংশীয়ই হোকনা কেন"। আল্লাহ্ পাক বলেন-"যারা সত্যিকার আলেম, তাদের মর্তবা অনেক বেশী"। এখানে মর্তবা দানকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্। যে ব্যক্তি আলেমকে নীচে নামাতে চায়-আল্লাহ্ তাকেই নীচে নামিয়ে জাহান্নামে

ফেলে দিবেন।

ইমাম খায়রুদ্দীন রমলী ফতোয়ায়ে খাইরিয়ায় বলেন-

كَوْنُهُ قُرَشِيًّا لَا يُبِيْحُ لَهُ التَّقَدُّمَ عَلَى ذِى الْعِلْمِ مَعَ جَهْلِهِ -

অর্থাৎ ঃ "কোন ব্যক্তি যদি কোরায়শী হয়েও জাহেল হয়-তাহলে আলেমের উপর তার মর্তবা দেওয়া দুরস্ত হবে না"। কেননা, এলেমই কোরাইশী ব্যক্তির উপর আলেমের ফযিলত দেওয়ার মাপকাঠি। আল্লাহ্ তায়ালা মূর্খ কোরায়শীর উপর আলেমের প্রধান্য দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। দলীল হলো-নবীজীর দুই শ্বশুর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) মর্তবা দুই জামাতা (ওসমান ও আলী) হতেও বেশী- যদিও উক্ত দুই জামাই (ওসমান ও আলী) বংশের ক্ষেত্রে নবীজীর বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন"। সুতরাং শুধু বংশের গুনে অগ্রাধিকার হয়না।

এতে বুঝা গেলো-ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) যুবক জান্নাতীদের সর্দার হওয়া সত্বেও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে সর্ব বিবেচনায় উত্তম নন। এজন্যই নবী করিম (দঃ) ইমাম হাসান-হোসাইনকে শুধু "যুবক জান্নাতীদের" সর্দার বলেছেন-বৃদ্ধদের নয়"।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীনকে বাদ দিয়েই ইমাম হাসান হোসাইনের বেলায় ঐ ধরণের উক্তি করেছেন। সুতরাং হাদীসখানা যুবকদের মধ্যেই সীমিত-বৃদ্ধদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। প্রমাণ স্বরূপ-বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এই কথা সমর্থন করেই পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে-

حَسَنٌ وَّحُسَيْنٌ سَيِّدَا شَبَابِ الْجَنَّةِ وَاَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا - رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ-

অর্থাৎ ঃ "ইমাম হাসান-হোসাইন কেবল জান্নাতী যুবকদের সর্দার-কিন্তু তাঁদের পিতা হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের চেয়েও উত্তম"। (ইবনে মাযা, হাকিম, তাবরানী ফীল কবীর, ইমাম মালেক-প্রমূখ মুহাদ্দেসগণ কর্তৃক হযরত ইবনে ওমর, ইবনে মাসউদ, কুররা ইবনে ইয়াছ হোয়াইরিছ-প্রমূখ থেকে রেওয়ায়াতকৃত)।

হাদীসে আরো আছে-

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ خَيْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَخَيْرُ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَخَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ

অর্থ ঃ "হযরত আবু বকর, হযরত ওমর (রাঃ) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উম্মতের চেয়ে উত্তম এবং নবী রাছুলগন ব্যতিত সকল আকাশবাসী ও জমীনবাসীদের চেয়েও উত্তম" । (হাকিম- ইবনে মাসউদ সূত্রে) ।

(বুঝা গেল- হাসান হোসাইন (রাঃ) হলেন যুবকদের সর্দার এবং খোলাফায়ে রাশেদীন হলেন বৃদ্ধদের সরদার-জলিল)

ছাওয়াল-০৮ ঃ নিম্ন বিষয়ে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের মতামত জানতে চাই-

"যায়েদ নামক এক ব্যক্তি হযরত আমির মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ আকিদা পোষণ করে এবং তাঁকে মন্দ বলে। সে উম্মূল মুমিনীন হযরত সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নামে সংঘটিত- "মিথ্যা অপবাদ" ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। তদুপরি-সে বর্তমানের শিয়া মুজতাহেদীনকে সম্মান দেয়, তাদের সাথে মোসাফাহা করে, হাতে চুমু খায়। আমর নামক এক ব্যক্তিকে দিয়ে নিজের নামে নিম্ন কবিতা বানিয়ে পাঠ করায় এবং কোন আপত্তি করেনা। যেমন-

এত্তেহায়ে আম্বিয়া আউলিয়া, তুম হি-তো হো,
তুম মোহাম্মদ, তুম আলী, তুম ফাতেমা নূরে আইন।
তুর পর মূছা, হরম মে মোস্তফা- তুমহি তো হো,
চান্দকে টুকড়ে কিয়ে থে, ওয়ে নবীকে রূপ মে।

এমতাবস্থায় যায়েদ কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে- কিনা?

জওয়াব ঃ নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ।

ছাওয়াল-০৯ ঃ ইমাম সাহেব নামাযের কেরাতের মধ্যে (দরূদ শরীফের আয়াত)- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا **পাঠ করার সময় হঠাৎ জনৈক মুসল্লীর মুখ থেকে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বেড়িয়ে পড়লো। এতে কি নামায ভঙ্গ হবে?**

দ্বিতীয় কথা- কেউ যদি "আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা" বলে-তাহলে দরুদ শরীফ পূর্ণ করা ফরয কিনা? নফল নামাযের কাযা আর দরূদ

শরীফের কাযা- এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

জওয়াব ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো- ঐ অবস্থায় দরূদ পড়লে নামায ভঙ্গ হবেনা। কেননা, সে ইমামের নির্দেশ মানেনি-বরং আল্লাহ্র নির্দেশ মানার উদ্দেশ্যেই "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" বলেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো- কোন কারণে দরুদ শরীফ অপূর্ণ রেখে ছেড়ে দিলে তা কাযা করা জরুরী নয়। নফল নামায আর দরূদ শরীফের হুকুম এক নয়। দুররে মোখতারে উল্লেখ আছে- সাত প্রকারের নফল নামায শুরু করলে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। প্রত্যেক নফল নামাযের বেলায় এই হুকুম নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে যে কোন নফল নামায শুরু করে ছেড়ে দেওয়া রোগাক্রান্ত মনের পরিচায়ক। পূর্ণ করা জরুরী।

ছাওয়াল-১০-১৫ ঃ নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় যুক্ত সম্পত্তির বণ্টন কিভাবে করতে হবে? যৌথ সম্পত্তির বিবরন হলো-

"এক ব্যক্তি মারা গেলো। তার দুই পুত্র গোলাম রসুল ও গোলাম আলী এবং এক কন্যা ফাতেমা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হলো। হঠাৎ প্রথম পুত্র গোলাম রসুল নিখোঁজ হয়ে গেলো। পিতার পূর্ণ সম্পত্তি দ্বিতীয় পুত্র গোলাম আলী ও ফাতেমা ভাগ বাটোয়ারা করে নিলো। নিখোঁজ গোলাম রসুলের জন্য তার অংশ পৃথক করা হলো না।

ইত্যবসরে দ্বিতীয় ভাই গোলাম আলীরও মৃত্যু হলো। সে দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী রেখে গেলো। দুই ছেলের নাম নবু মিয়া ও গোলাম নবী। মেয়ের নাম বিবি বু এবং স্ত্রীর নাম আয়েশা। ছেলেরা নাবালেগ ছিল। তাই স্ত্রী আয়েশা স্বামীর নগদ টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেদের লালন পালন করেছে। স্বামীর টাকা-পয়সার কথা কাউকে বলেনি এবং স্বামীর প্রদত্ত গহনা ও স্থাবর সম্পত্তি এবং নিখোঁজ ভাসুর গোলাম রসুলের সম্পত্তিসহ নিজ ভোগ দখলে রেখেছে। ছেলে মেয়েরা বড় হলে প্রথমে মেয়ে বিবি বু-এর বিবাহ দেওয়া হয়। ঐ বিবাহে মেয়েকে বাড়ী ও গহনাপত্র দিয়ে বিদায় করা হয়।

তারপর দুই ছেলে-নবু ও গোলাম নবী পিতা এবং জেঠার যৌথ সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে নেয়। এই দুই ছেলের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যুর পর তার সন্তানরা ও সমস্ত যৌথ সম্পত্তি পুণরায় নিজেদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে নেয় এবং কিছু সম্পত্তি (স্থাবর) বিক্রিও করে ফেলে। এতাবস্থায় যৌথ সম্পত্তি বন্টনের বেলায় কয়েকটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। যথা-

(ক) ঃ গোলাম আলীর আওলাদ এবং তাদের আওলাদের সম্পত্তি হতে নিখোঁজ গোলাম রাসুলের সম্পত্তি বাদ দিতে হবে কিনা? নিখোঁজ গোলাম রাসুলের সন্তানদের খোঁজ পাওয়া গেলেও পরে তারা পুনরায় নিখোঁজ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নিখোঁজ গোলাম রাসুলের নিখোঁজ সন্তানদের জন্য যৌথ সম্পত্তি হতে পৃথক করে রাখা লাগবে কিনা? তারা এই সম্পত্তিতে নিখোঁজ পিতার উত্তরাধিকারী হবে কিনা? যদি উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? আর যদি পৃথক করে রাখতেই হয়- তাহলে কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? এবং মূল সম্পত্তি ও গহনাপত্র রাখতে হবে- নাকি তার মূল্য? মূল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয়- কেননা, ইতিমধ্যে কিছু বিক্রিও হয়ে গেছে। **মূল কথা হলো- নিখোঁজদের বেলায় মালিকানা কতদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে?**

(খ) ঃ দ্বিতীয় ভাই গোলাম আলীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আয়েশা স্বামীর রেখে যাওয়া যৌথ সম্পত্তি হতে দুই ছেলে ও এক মেয়ের লালন পালন ও বিয়ে শাদীতে যা খরচ করেছে- তা কি তাদের মিরাছের হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে?

(গ) ঃ মৃত ব্যক্তির কোন একজন ওয়ারিসকে সম্পত্তির হিস্যা দেওয়া হলো না। সে অন্যদের সাথে মিলে মিশে দিন গুজরান করেছে। এমতাবস্থায় তার মিরাছ কি বাতিল হবে- নাকি বহাল থাকবে? বঞ্চিত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সন্তানেরা বা স্ত্রী ঐ সম্পত্তিতে মিরাছ দাবী করতে পারবে কিনা? (যেমন নিখোঁজ গোলাম রাসুলের সন্তানাদি)।

(ঘ) ঃ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসানদের মধ্যে কোন একজনকে হিস্যা দেওয়া হলো না। অন্যান্য ওয়ারিসগণ পুত্র পৌত্রাদিসহ পূরা সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নিলে তা কি তাদের জন্য জায়েয হবে? তারা কি এই দাবী করতে পারবে যে, আমরা তো পিতার নিকট থেকে পেয়েছি- তাই আমাদের জন্য সব সম্পত্তিই হালাল। বর্ণিত অবস্থায় দ্বিতীয় জীবিত ভাই গোলাম আলীর সন্তান ও তস্য সন্তানেরা কি

এরূপ দাবী করে নিখোঁজ প্রথম ভাই গোলাম রাসুলের হিস্যা যবর দখলে রাখতে পারবে?

(ঙ) ঃ মৃত ব্যক্তির যৌথ সম্পত্তি কি তার ওয়ারিসানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে?

(চ) ঃ গোলাম আলীর সন্তান ও তস্য সন্তানেরা নিখোঁজ জেঠা গোলাম রাসুলের হিস্যার মূল্যকে আমানত হিসাবে রাখবে- নাকি ঋণ হিসাবে? নিখোঁজ ব্যক্তির ঘর ও সম্পত্তি ভোগ দখল করা কি জায়েয হবে?

জওয়াব ঃ (ক) গোলাম রাসুল পিতার মৃত্যুর পর নিখোঁজ হয়েছে- সুতরাং সে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হয়েছে। সেমতে তার সন্তানেরাও পিতার পরে মালিক সাব্যস্থ হবে- যদিও যৌথ সম্পত্তি হোক না কেন। নিখোঁজ হলেই তার সম্পত্তির অধিকার ছিন্ন হয় না। তার বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি ও গহনাপত্র সংরক্ষণ করা জরুরী। স্থাবর সম্পত্তি হুবহু সংরক্ষণ করা ফরয। এ সম্পত্তি বিক্রি করে মূল্য সংরক্ষণ করার অনুমতি শরিয়তে নেই।

দ্বিতীয় ভাইয়ের স্ত্রী আয়েশা নিজের ও নিজ সন্তানের জন্য যা কিছু যৌথ সম্পত্তি হতে খরচ করেছে-তার অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। গোলাম রাসুল নিখোঁজ হওয়ার সময় যার অধীনে সম্পত্তি ছিল সেই উহার আমানতদার বলে বিবেচিত হবে।

যদি সে অন্যকে আমানতদার না বানিয়ে থাকে, তাহলে মহল্লার সব মুসলমান যোগ্য সৎ ব্যক্তিকে আমানতদার বানাবে। এই আমানত নিখোঁজ গোলাম রাসুলের বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। এর মধ্যে তার খোঁজ পাওয়া গেলে তাকে বুঝিয়ে দেবে। নতুবা ৭০ বৎসর পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে আমানতি সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। তার ছেলেদের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটির ফায়সালাও অনুরূপভাবে করতে হবে। (ভাইয়ালী হক্ব এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না-জলিল)।

(খ) গোলাম আলীর স্ত্রী আয়েশা সন্তানাদির জন্য যা খরচ করেছে- তা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে থাকলে ঐ খরচ সন্তানাদির হিস্যায় গণ্য হবে। আয়েশা ভাসুরের সম্পত্তির হেফজতকারীনী হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে থাকলে দায়িত্ব পালন করবে- নতুবা যা অতিরিক্ত খরচ করেছে, তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দায়িত্ব বহন করে এর ক্ষতিপূরণ দেবে।

(গ) হিস্যা কেউ না নিলে তা বাতিল হয়ে যায় না। তার আওলাদগণ দাবী করতে পারবে। (যেমন, নানার সম্পত্তিতে নাতীদের হিস্যা-জলিল)।

(ঘ) ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অন্যের হিস্যা থাকলে তা ভোগ করা হালাল হবেনা। এরূপ খেয়াল করা যে, আমরা তো পিতার থেকে পেয়েছি- তাই আমাদের জন্য সব হালাল। এই ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও গলদ। নিখোঁজ গোলাম রাসূলের সম্পত্তি ভোগ করা গোলাম আলীর আওলাদের জন্য দুরস্ত হবে না।

(ঙ) মৃত ব্যক্তির নাজায়েয উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সন্তানদের জন্য ঐ সময় জায়েয হবে- যদি অবস্থা জানা না থাকে অথবা নির্দিষ্ট করে হারাম উপার্জিত মাল সম্পর্কে জানা না থাকে, অথবা কি পরিমাণ হারাম- তা জানা না থাকে, অথবা ঐ মালের মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে। তা যদি না হয়, তাহলে মালিককে সন্ধান করে ফেরত দিতে হবে। পাওয়া না গেলে তার পক্ষে মুসলমান ফকির, মিছকিনের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। হারাম মাল কোনমতেই ভক্ষণ করা যাবে না।

(ঘুষখোর চাকরী যাদের সন্তানের বেলায়ও একই হুকুম। পিতার অবৈধ উপার্জিত অর্থ ফকির মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং সাওয়াবের নিয়ত করতে পারবেনা-জলিল)।

(চ) ষষ্ঠ প্রশ্নের জওয়াব উপরোক্ত পাঁচটি জওয়াবের মধ্যেই এসে গেছে।

ছাওয়াল-১৬ ঃ হিন্দা নাম্নী জনৈকা মহিলা খুবই গরীব। বেহাল অবস্থা তার। স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার পর রুজী রোজগার বন্ধ। ভাইয়ের কাছে থাকে। ভাই যায়েদ শ্রমিকের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়। হিন্দার স্বামীর একশ পঞ্চাশ গজ দৈর্ঘ্য একটি যৌথ বাড়ী বর্তমানে ভাঙ্গাচুড়া অবস্থায় আছে। ঐ বাড়ীর মালিক ছিল হিন্দার স্বামী ও ভাসুর। ভাসুর নিজের অংশ ছেলেকে দিয়েছে। এখন ভাইয়ের অংশও দখল করে বিক্রয় করতে চায় এবং সে বলে- "এতে হিন্দার কোন হক্ব নেই। আমার ভাই ত্রিশ বৎসর পূর্বে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়েছে, কেননা। আইনে বলে- স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পর মোহরানা দাবী করা যাবে না। সুতরাং আমিই এখন পূর্ণ ঘরের মালিক"।

উকিল মহিলাকে পরামর্শ দিয়েছে- তুমি মোহরানা দাবী করো, পেয়ে যাবে। এমতাবস্থায় হিন্দা ভাসুরকে গিয়ে বললো- আপনি আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ আজ শোনালেন। আমি নিজেকে কখনও বিধবা মনে করিনি- কেননা স্বামী নিখোঁজ। আপনি আজ সংবাদ দিলেন- আমার স্বামী ইন্তেকাল করেছে। তাহলে আপনার কথামতই আজ হতে আগামী তিন বৎসর আমি মোহরানা দাবী করতে পারবো"।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে- মোহরানা কত ধার্য্য করা হয়েছিল- তা হিন্দার আত্মীয়স্বজনরা কেউ বলতে পারে না। কেননা, বিয়ে হয়েছিলো ৪০ বৎসর পূর্বে। কিন্তু হিন্দা বলছে- আমার মোহরানা দুইশত রুপি ধার্য করা হয়েছিল। আমার মা এবং ফুফুর মোহরও ছিল দুইশত রুপি করে। বর্তমানে আমার ভাই ও ভাতিজারা দুইশত রুপি মোহর দিয়ে বিয়ে করেছে। এমতাবস্থায় হিন্দার দাবী অনুসারে মহল্লাবাসী কি দুইশত রুপি আদায়ের রায় দিতে পারবে? যদি মহল্লাবাসীর সাক্ষ্যমতে মহিলা দুইশত রুপি পেয়ে যায়- তাহলে স্বচ্ছলভাবে চলে যেতে পারবে। বর্তমানে তার ভাসুর তার কোন খোঁজ খবর রাখেনা। এ ব্যাপারে ফয়সালা জানতে চাই।

জওয়াব ঃ হিন্দার দাবীমতে সে সম্পত্তি ও মোহরানার হকদ্বার। হিন্দার খান্দানে প্রচলিত মোহর (মোহরে মিছাল) আদায় করতে হবে। শুনা কথায় সাক্ষী দেওয়া যাবেনা। বরং বলতে হবে- হিন্দার খান্দানে প্রচলিত মোহর দুইশত রুপি। মামলার ডিগ্রী পাওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

ছাওয়াল-১৭ ঃ যায়েদ নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রী হিন্দার খারাপ চালচলনের কারনে তাকে তালাক দিলো। স্ত্রী তালাক পাওয়ার পর আমর নামক অন্য এক ব্যক্তির সাথে বসবাস করতে থাকে। এমতাবস্থায় হিন্দা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পূর্ব স্বামীর তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আমর তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর আমর জানতে পারে- হিন্দার গর্ভের সন্তানটি তার অবৈধ মিলনের ফসল। এই বিবাহ জায়েয হবে কিনা? মহিলার তালাকের ইদ্দত কতদিন হবে?

জওয়াব ঃ যুবতী মহিলাদের বেলায় তালাকের ইদ্দত হলো তিন হায়েয। এর মধ্যে অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারবে না। যাদের এখনও হায়েয হয়নি-অথবা যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে- এমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিলাদের বেলায় ইদ্দত হলো তিন মাস। গর্ভবতীর জন্য ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস পর্যন্ত। কোরআন মজিদে স্পষ্ট করে এই নির্দেশ এসেছে।

ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আমর হিন্দার সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং তাকে গর্ভবতীও করে ফেলেছে। এটার আবার কেমন ইদ্দত হলো যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে বিবাহ করেছে? (গর্ভবতীর ইদ্দত তো সন্তান খালাস হওয়া পর্যন্ত এর মধ্যে সে বিবাহ করলো কি ভাবে?-জলিল)।

যায়েদ কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হিন্দার ইদ্দত ছিলো তিন হায়েয। যারা হামেলা হয়ে যায়- তাদের তো হায়েয হয়না। হামেলার বেলায় তো ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। গর্ভবতী হিন্দার ইদ্দত শেষ হলো কোথায়? এটা কাকতালীয় কথা। সুতরাং গর্ভের সন্তান খালাস হওয়ার পর তার ইদ্দত শেষ হবে।

সুতরাং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে আমরের সাথে তার এই বিয়ে ফাসেদ হয়ে গিয়েছে। আমরের উপর এখনই হিন্দাকে পৃথক করে দেওয়া ফরয। পেটের সন্তান যদি দুই বৎসরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়- তাহলে আইনতঃ পূর্ব স্বামীর সন্তান বলে গন্য হবে। গর্ভ খালাস হওয়ার পর আমর তাকে নতুন করে বিবাহ করতে পারবে-তবে গর্ভস্থিত সন্তান হবে পূর্ব-স্বামীর।

হাঁ, তালাকের পর দুই বৎসর পর যদি সন্তান হয়, তাহলে প্রথম স্বামীর সন্তান সাব্যস্ত হবেনা। এখন জোড়াতালি দিয়ে আমরের সাথে বিবাহ হতে পারবে এবং সন্তানও তার স্বীকৃতিমতে তার বলে গন্য হবে-যদিও অবৈব।

ছাওয়াল-১৮ ঃ পঞ্জিকা মতে শা'বান চাঁদের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধায় রোযার নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু মেঘের কারনে চাঁদ দেখা গেলোনা। পরদিন শুক্রবার একটু বড় চাঁদ দেখা গেলো। লোকেরা বলাবলি করল-চাঁদ গতকালেরই ছিলো। ৩০ দিন রোযা পূর্ণ হয়ে পঞ্জিকায় বর্ণিত ঈদের তারিখ লেখা আছে রবিবার। কিন্তু শর্ত ছিলো চাঁদ দেখা যাওয়া সাপেক্ষো। এমতাবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক ঈদ কি ৩০ দিন পূর্ণ করে সোমবার হবে-নাকি পঞ্জিকা মতে রোববারে? যদি ঈদ রোববার করে ফেলে, তাহলে দুরস্ত হবে কিনা? (কেননা পঞ্জিকার তারিখ মতে শেষ শনিবারে রোযা ৩০ টি হয়, আর দর্শন অনুযায়ী

রোযা হবে ২৯ টি। অনুবাদক)

জওয়াব ঃ পবিত্র শরিয়াতে চাঁদ দেখা যাওয়া শর্ত। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব। চাঁদ এই শহরে দেখা হোক-. কিংবা অন্য কোন স্থানে হোক, নির্ভোরযোগ্য সুত্রে সাক্ষ্য পাওয়া গেলেই রোযা রাখতে হবে অথবা ঈদ করতে হবে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّهٗ لِرُؤْيَتِهٖ

"আল্লাহ তায়ালা চাঁদ দেখা যাওয়ার পক্ষে আছেন" কোন চিঠি বা টেলিফোন বা অনুমান বা অন্যস্থানের রোযা পালন বা ঈদ পালনের খবর শুনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ- যদি কিছু লোক এসে খবর দেয় যে, অমুক শহরে অমুক দিন রোযা শুরু হয়েছে বা অমুক দিন ঈদ হয়ে গেছে, তাহলে তার এই কথা বিশ্বাস করা যাবে না- যে পর্যন্ত শরিয়তসম্মত আদেশ বা নির্ভরযোগ্য লোক নিজে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না দেয়।

দোররে মোখতার গ্রন্থে লেখা আছে-

لَااَشْهَدُوْا بِرُؤْيَتِهٖ غَيْرُهُمْ لِاَنَّهٗ حِكَايَةٌ

অর্থঃ "অন্যের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণযোগ্য নয়- যে পর্যন্ত নিজে না দেখবে। কেননা এটা হলো ঘটনা বর্ণনা বা খবর -এটি সাক্ষ্য নয়"।

পঞ্জিকায় যদি শর্ত সাপেক্ষ রোযা বা ঈদের কথা লেখা থাকে, তাহলে এটাও তো সন্দেহজনক কথাই হলো। আর নিশ্চয়তা দিয়েও যদি লেখা থাকে- তবুও পঞ্জিকার হিসাব মতে শরিয়তে রোযা রাখা বা ঈদ করার অনুমতি নেই।

দোররে মোখতারে উল্লেখ আছে-

لَاعِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُؤَقِّتِيْنَ وَلَوْ عُدُوْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ -

অর্থাৎ ঃ "জোতির্বিদদের কথা শরিয়তের দলিল নয়-যদিও তারা নির্ভরযোগ্যই হোকনা কেন। ইহাই মাযহাবের সঠিক মাসআলা"।

চাঁদ বড় দেখা যাওয়ার ব্যাপারটি ২ দিন গণ্য করা শরিয়তে নাজায়েয।

"হাদীস শরীফে এসেছে-

مَنْ اِقْتَرَابَ السَّاعَةِ اِنْتِفَاخُ الْاَهِلَّةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ "কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার এটিও একটি আলামত যে, নূতন চাঁদ মোটা দেখা যাবে (দুই দিনের মত)। লোকেরা বলবে- গতকালের চাঁদ।"(তাবরানী-ইবনে মাসউদ সূত্রে)।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত চাঁদ দেখা না গেলে পঞ্জিকা হিসাবে কোনমতেই রোববার ঈদ করা যাবে না- কেননা রোযার চাঁদ দেখা গিয়েছিলো শুক্রবার সন্ধ্যায়। সে হিসাবে রোযা ৩০ দিন পূর্ণ হবে রোববারে। কাজেই শনিবারে চাঁদ না দেখলে ঈদ হবে সোমবারে। সুতরাং চাঁদ দেখা সাপেক্ষেই ঈদ করতে হবে।

ঈদ বা কোরবানী দুনিয়ার কোন অনুষ্ঠান নয়। এখানে আল্লাহ্‌র হুকুম কার্যকর হবে। যতক্ষণ শরিয়ত মোতাবেক না হবে- ততক্ষন মান্য করা যাবে না। মনে করুন-রোযার চাঁদ যদি পঞ্জিকামতে সত্যই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ই হয়ে থাকে-কিন্তু দেখা যায়নি- তাহলেও সোমবারের ঈদই শুদ্ধ হবে- কেননা এটা দেখার উপর নির্ভরশীল। আর যদি শুক্রবার সন্ধ্যায় হয়ে থাকে, তাহলে শনিবার ২৯ পূর্ণ করে চাঁদ না দেখে রোববারে ঈদ করা কোনমতেই জায়েয হবেনা- কেননা ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা যায়নি। এমন অবস্থায় রোববারে ঈদ পড়া শরিয়ত এবং বিবেক- উভয়েরই খেলাফ। নিজেদের খামখেয়ালী ও বিবেচনা দ্বারা এগুলো চলেনা। শরীয়তের আমল শরিয়তের নীতি অনুযায়ীই চলবে-পঞ্জিকা মতে নয়।

ছাওয়াল-১৯ঃ নামাযের তাশাহ্‌হুদের মধ্যে **"আসসালামু আলাইকা আইয়ূহান্ নবী"** বলার সময় কি নিজে ছালাম আরয করার খেয়াল করবে- নাকি আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম পেশ করার খেয়াল করবে? আর উভয় প্রকারের খেয়াল করা কি নামায ভঙ্গকারী?

জওয়াব ঃ নামাযের মধ্যে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খেয়াল করতে হবে। হুযুরের সাথে কথা বলা বা হুযুরের ডাকে সাড়া দেওয়া নামায ভঙ্গকারী নয়। (অন্যের বেলায় ইহা নামায ভঙ্গকারী) আল্লাহ্ তায়ালা এপ্রসঙ্গে এরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ-

অর্থাৎ ঃ **"হে মোমেনগণ! যখনই আল্লাহ্‌র রাসুল তোমাদেরকে ডাকেন, তখনই তোমরা আল্লাহ্-রাসুলের ডাকে সাড়া দাও"**। (সূরা আনফাল)

উক্ত আয়াত একজন সাহাবীর শানে নাযিল হয়েছে- যিনি নামাযরত অবস্থায় রাসুলে পাকের ডাকে সাড়া না দিয়ে নামাযে ব্যস্ত ছিলেন। নামায শেষে ঐ সাহাবী রাসুলে পাকের খেদমতে উপস্থিত হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- "তুমি কি আল্লাহর উপরোক্ত আয়াত শোন নি"?

(বুঝা গেলো- নামাযে হুযুরের খেদমত করলে এবং কথা বললে বা খেয়াল করলে নামায ভঙ্গ হয়না- বরং অধিক পূর্ণ হয়। কিন্তু দেওবন্দী 'সিরাতে মোস্তাকীম' কিতাবে লিখা আছে- নামাযে আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্যের খেয়াল- এমনকি রাসুলের খেয়াল মনে আসলেও জ্বিনা এবং গরুগাধার খেয়ালের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে"-নাউযুবিল্লাহ-অনুবাদক)।

"যুল-ইয়াদাঈন" নামে এক সাহাবীর একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে- কোন এক নামাযে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাকআতে ভুল হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবীদের সাথে তিনি কথা বলেছিলেন এবং সাহাবীগণও হুযুরের সাথে কথা বলেছিলেন। কথাবার্তায় যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে,-হুযুরের নামাযের রাকআতে সত্যিই ভুল (ছাহো) হয়েছে, তখন তিনি বাকী নামায পূর্ণ করে ছাহো সিজদা করেছিলেন। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে উম্মতের শিক্ষার জন্য। ওনাদের পরস্পরের কথায় ঐ নামায ভঙ্গ হয়নি। ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নামাযের মধ্যে কেউ যদি ভুলেও অন্যকে সালাম দেয়, তাহলেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু হুযুরের বেলায় বলা হয়েছে- "নামাযের মধ্যখানেও হুযুরের খেদমতে সম্বোধন করে সালাম আরয করতে হবে"। [ইহা নামায ভঙ্গকারী নয়-অনুবাদক]

[তাশাহ্‌হুদের মধ্যে আসসালামু আলাইকা (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ) বলার সময় হুযুরকে সম্বোধন করে সালাম দিতে হবে- মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা এখানে যথেষ্ট নয়। মোদ্দা কথা-নামাযের মধ্যে সালাম পাঠকালে হুযুরের খেয়াল করতে হবে। (ফতুয়া আলমগীরী ও ফতোয়ায়ে শামী- অনুবাদক]।

ছাওয়াল-২০ঃ আহ্‌লে হাদীস বা গায়রে মোকাল্লেদ -এর নিকট এমন কোন্ বিষয় বৈধ- যা চার মাযহাব মতে নাজায়েয?

জওয়াব ঃ এমন অনেক বিষয় আছে- যা লা-মাযহাবী বা আহ্‌লে হাদীসের নিকট জায়েয- অথচ চার মাযহাব মতে হারাম। যেমন-

(১) একসঙ্গে তিন তালাক দিলে চার মাযহাব মতে তিন তালাক হবে- কিন্তু লা মাযহাবীদের মতে এক তালাক হবে। (এভাবে তারা ৯ তালাক দিলে তাদের মতে ৩ তালাক পূর্ন হবে-অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) পাগড়ীর উপর মোছেহ করা না জায়েয। পাগড়ী খুলে মাথা মুসেহ করা চার মাযহাবে ফরয- কিন্তু লা মাযহাবীদের মতে পাগড়ীর উপর মুসেহ করা জায়েয (তোহ্ফাতুল মোমেনীন পৃঃ-১৭)

(৩) চার মাযহাব মতে আপন ফুফুকে বিবাহ করা হারাম- কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে জায়েয (তোহ্ফাতুল মোমেনীন)।

(৪) চার মাযহাব মতে রক্ত, শরাব ও শুকরের চর্বি নাপাক- কিন্তু তাদের মতে নাপাক নয় (রওযা নদবা পৃঃ-১২)।

ছাওয়াল-২১ ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) -এর ইজতিহাদ ও কিয়াছকে যারা বাতিল বলে- তাদের হুকুম কী?

জওয়াব ঃ আলমগীরী সহ অন্যান্য ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে- যারা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কিয়াছ ও ইজতিহাদকে হক্ব না জানবে, সে কাফের।

ছাওয়াল-২২ ঃ শাইখাঈন-অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যারা গালি দেয়- তাদের ব্যাপারে উলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের ফতোয়া কী?

জওয়াব ঃ যারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুককে (রাঃ) খারাপ বলবে- অনেক উলামায়ে কেরামের মতে তারা কাফের। তাদের বদদ্বীন ও বেদ্বীন হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

(তানভিরুল আবছার, দুররে মোখতার, ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ফতোয়ায়ে খোলাসা, ফতহুল ক্বাদীর, আশ্‌বাহ ওয়ান নাযায়ের, বাহরুর রায়েক, গুনিয়া, আকদুদ দুররিয়া প্রভৃতি)।

ছাওয়াল-২৩ ঃ লা-মাযহাবী বা আহ্লে হাদীসের পিছনে হানাফীদের নামায পড়া জায়েয হবে কিনা?

জওয়াব ঃ না, জায়েয নেই। কেননা, লা-মাযহাবী গায়রে মোকাল্লেদগণ "আহ্লে বিদআত" বা বাতিল আকিদাপন্থী। বিদআতপন্থী ইমামের পিছনে নামায পড়া দুরস্ত নেই। ফতহুল ক্বাদীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ)- সকলের সম্মিলিত রায় হলো- আহ্লে বিদআত বাতিল পন্থী ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই"। (ফত্হুল ক্বাদীর)

তদুপরি- লা মাযহাবীদের মাসআলা আমাদের এত বিরোধী যে, তাদের ত্বাহারাত ও নামায আমাদের মাযহাব মতে ঠিক হয় না।

তারা মৃত জন্তু ও শুকরের চর্বিকে পাক মনে করে। তাদের মতে এক কৌটা পানিতে ছয় মাশা পরিমাণ পেশাব পড়লে পানি নাপাক হয় না। তাদের মাযহাব মতে পানির রং বা স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত পানি পাক। (দেখুন আহ্লে হাদীসের কিতাব ফতহুল মুগীস পৃঃ ১৫ এবং তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া পৃঃ ৬-৭)

ছাওয়াল-২৪ ঃ লা-মাযহাবী বা আহ্লে হাদীসদের বিদআতী আক্বিদায় কি কি কুফরী আছে- যার দরূন তাদেরকে কাফের বলা যেতে পারে?

জওয়াব ঃ অনেক কারনেই তাদের বাতিল আক্বিদা কুফরী সীমায় পৌঁছেছে। যথা-

(ক) তারা সাহাবীগণের ইজমা, মোজতাহিদগণের কিয়াছ ও ইজতিহাদকে অস্বীকার করে। তাদের নেতা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী লিখেছে-"কিয়াছ বাতিল এবং ইজমার কোন ভিত্তি নেই"। অথচ আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেছেন-"ইজমা ও কিয়াছ হচ্ছে ধর্মীয় মৌলিক বিধান" (চার দলীলের মধ্যে এই দুইটি ২য় ও ৩য় দলীল -জলিল) ইজমা ও কিয়াছ অস্বীকার করা কুফরী। ইজমা ও কিয়াছ অমান্যকারী মুসলমান নয়। দেখুন- ইমাম আবদুল আজিজ বুখারীর "ফুসুলুল বাদায়ে" মাওয়াকিফ, শরহে মাওয়াকিফ, ফাওয়াতিহ, তানভীরুল আবছার, দুররে মোখতার, শরহে ফিকহে আকবর, ইমাম ইবনে হাজর -এর 'ই'লাম', বাহরুর রায়েক, ফতোয়া শামী- প্রভৃতি।

(খ) আহলে হাদীসদের ইমাম ইসমাইল দেহলভী তার "ইযাহুল হক' গ্রন্থে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্থান-কাল থেকে পবিত্র মনে করাকে কুফরী বলেছে।

(গ) ইসমাঈল দেহলভী তার "তাকভীয়াতুল ঈমান" গ্রন্থে পিয়ারা নবীজীর শানে মস্তবড় বেয়াদবীমূলক ৭০টি কথা লিখেছে- যেগুলো সরাসরি কুফরী কলেমা। (কাজী আয়ায, সাইফুল মাসলুল)

(ঘ) 'তাকভীয়াতুল ঈমান' বইয়ে সে লিখেছে- "নবী করিম (দঃ) মরে মাটি হয়ে গেছেন" (নাউযুবিল্লাহ)। ইহা সরাসরি কুফরী। (যারকানী শরহে মাওয়াহিব)।

(ঙ) আহ্লে হাদীস বা লা-মাযহাবী অনুসারী সবাই "তাকলীদ বা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাব" মানাকে শির্ক বলে গণ্য করে এবং মাযহাব পন্থীদেরকে মুশরিক বলে। ইহা সরাসরি কুফরী (দেখুন দুররে মুখতার, দুরার, গুরার, মাজমাউল আনহুর, আলমগীরী, শরহে ফিকহে আকবর- প্রভৃতি।)

ছাওয়াল-২৫ ঃ কোন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো তার জন্য "ধর্মীয় মর্যাদা" কিনা? বিদআতী আকিদাধারী লোককে ইমাম বানিয়ে "এই মর্যাদা" দেওয়া হারাম হবে কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, লা মাযহাবীকে ইমাম বানানো তার জন্য ধর্মীয় মর্যাদা। তাকে ইমাম বানানো হানাফীদের জন্য হারাম। (দেখুন ফতোয়া শামী, ফতহুল ক্বাদীর, তাহতাভী শরীফ, জায়লায়ী প্রভৃতি)।

মিশকাত শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ -

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থী বা বাতিলপন্থীকে সম্মান করলো- সে নিশ্চিতভাবে দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো"।

ছাওয়াল-২৬ ঃ বিদআতী আক্বিদাধারী এবং সুন্নী ফাছেক ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী ও নিষেধ কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, মাকরূহে তাহরীমী ও নিষেধ। (দেখুন তাহতাভী, দুররে মোখতার, মারাকিউল ফালাহ;. জায়লায়ীর তিবইয়ানুল হাকায়েক, ফতোয়ায়ে শামী, গুনিয়া, ছগীরী, ফতহুল মুয়ীন- প্রভৃতি।)

ছাওয়াল-২৭ ঃ মসজিদে সকল মুসলমানের সমান অধিকার আছে কিনা? মুসলমান কাকে বলে?

জওয়াব ঃ মুসলমান হলো- যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। উম্মতের এক অর্থ হলো-যাদের নিকট তিনি প্রেরিত। এই অর্থে-সমগ্র মানব জাতিই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত- কিন্তু মুসলমান নয়। এদেরকে বলা হয় "উম্মতে দাওয়াত"। উম্মতের আরেক অর্থ- যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছে। তাদেরকে বলা হয় "উম্মতে ইজাবত"। উম্মতে ইজাবতকেই প্রকৃতপক্ষে বলা হয় মুসলমান। এখন উম্মত বললে মুসলমানকেই বুঝায়। ইহা ব্যবহারিক বা প্রচলিত অর্থ।

যারা দাওয়াত পূর্ণভাবে কবুল করেছে এবং সত্যকে পূর্ণভাবে মেনেছে- এমন প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে মসজিদে আসার।

কিন্তু বিদআতপন্থী বা বাতিল আক্বিদাধারীরা এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই মুসলমানের মসজিদে তাদের আসার এবং বসার কোন আইনগত অধিকার নেই। (দেখুন সদরুস শরিয়ার তাওযীহ্ এবং তাফ্তাযানীর তালভীহ)।

ছাওয়াল-২৮ ঃ ইমাম নিয়োগের বেলায় মুসল্লীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণযোগ্য- নাকি সংখ্যা লঘিষ্ঠের?

জওয়াব ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গ্রহণযোগ্য। এমনকি, অধিকাংশ মুসল্লীদের পছন্দনীয় ইমাম থেকে যদি অন্যজন বেশী উপযুক্তও হোন- তাহলেও তাদের মতামতই অগ্রগণ্য এবং গ্রহণযোগ্য। তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। (আলমগীরী)।

ছাওয়াল-২৯ ঃ শিয়া ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয কিনা?

জওয়াব ঃ শিয়াদের মধ্যে অনেক উপদল (৬৪ দল) আছে। তাদের একটি উপদল হলো "তাফদীলী" অর্থাৎ যারা সকল সাহাবায়ে কেরামকেই মানে-তবে হযরত আলী (রাঃ)কে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর প্রাধান্য দেয়। এদের পিছনে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী। (দেখুন "আরকানে আরবাআ")।

শিয়াদের অন্য একটি উপদল আছে-যাদেরকে তাবাররাই " বলা হয়। ফোকাহায়ে কেরামের মতে তাদের পিছনে নামায পড়লে বাতিল হয়ে যাবে। (খোলাসা, আলমগীরী)।

শিয়াদের অন্য যেসব উপদল শরিয়তের মৌলিক বিষয় অস্বীকার করে, তারা সর্বমতে অমুসলমান। তাদের পিছনে নামায বাতিল ও নাজায়েয। (৭২ ফের্কার সবাই বাতিল-তাই তাদের পিছনে নামায হবেনা-জলিল)।

ছাওয়াল-৩০ ঃ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা তার আওলাদের কেউ ইমামতির দাবী করলে তা সঠিক বলে গন্য হবে-নাকি বাতিল বলে গন্য হবে? মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার আওলাদগণ মোয়াযিযন বা খাদিম হওয়ার অধিকারী কিনা?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, উপযুক্ততার শর্তে তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অনুপযুক্তদের দাবী ফতোয়ার খেলাফ। (আলমগীরী, কাযীখান)।

অন্য ইমাম মোয়াযিযন নিয়োগের বেলায়ও তাদের মতামতের অধিকার স্বীকৃত। প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে উপযুক্ততার ভিত্তিতে তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওলাদগনের অগ্রাধিকার রয়েছে (হামুডী- শরহে আশ্‌বাহ্‌)।

ছাওয়াল-৩১ ঃ যায়েদ নামক এক ব্যক্তি দেওবন্দী ফের্কাকে কুফরী আক্বিদাধারী বলে স্বীকার করে বটে, কিন্তু একথাও বলে- আমি তাদেরকে নিজে কাফের বলবোনা। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে-"দেওবন্দীরা কুফরী কথা বলে সত্য, কিন্তু বিচার করলে তাদের কুফরী আমাদের উপরই বর্তায়।

কেননা, কুফরী দুই প্রকার (১) কথায় (২) কাজে। কথায় কুফরী হলো-কোনব্যক্তি এমন কথা উচ্চারণ করলো-যাতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অস্বীকার বুঝায়। যেমন, দেওবন্দীরা তাদের কিতাবে আল্লাহ্‌- রাসুলের শানে এমন সব উক্তি করেছে, যা সরাসরি অবমাননার শামিল। কাজে কুফরী হলো- যেমন-ব্রাহ্মনদের পৈতা পরিধান করা, মূর্তিকে সিজদা করা, কোরআন শরীফকে নাপাক জায়গায় নিক্ষেপ করা। (তাঁর মতে এই কুফরী সুন্নীদের উপর বর্তায়-জলিল)।

সে আরও বলে- "দেখুন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্ব বিষয়ে হাকীম মানিনা-অন্যের বিচার মানি। আমরা ইংরেজের আদালতে বিচার চাই ও তাদের বিচার মানি। সুতরাং আমরা (সুন্নীরা?) দেওবন্দীদের চেয়েও খারাপ। তাই সূরা নিসার ৫ নম্বর রুকু অনুযায়ী আমরাই কাফির প্রমানিত হচ্ছি"।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন-**"হে হাবীব! আপনার প্রভূর কসম, যারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে আপনাকে হাকীম মানবে না, আপনার প্রদত্ত ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবেনা এবং পূর্ণভাবে আপনার কাছে আত্মসমর্পনও করবেনা- তারা কখনও মোমেন বলে গন্য হবেনা"** (সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)।

সে আরও বলে- আমরা যখন নবীজীর আদেশ না মেনে ইংরেজের রায় মানি, তখন আমরাই তো (সুন্নীরা) বড় কাফের। তাহলে অন্যকে (দেওবন্দীকে) কিভাবে কাফের বলবো?

-এখন প্রশ্ন হলো- যায়েদের এসব কুটযুক্তি ও কুটনীতিপূর্ণ কথায় সে কি সুন্নী- নাকি অন্য কিছু? আর উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাই বা কী?

জওয়াব ঃ যায়েদের জবাব ও যুক্তি তার মনের গোপন রোগেরই বহিঃপ্রকাশ। মামলায় যে বাদী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সরকারের

কাছে সাধারণতঃ বিচার প্রার্থী হতে চায়না- কিন্তু যে দাবী সরকারী ক্ষমতা ছাড়া আদায় হয় না, বাধ্য হয়েই তা ঐভাবে করতে হয়।

আর বিবাদী যদি সত্যের উপর হয়-তাহলে সেও সরকারের নিকট ধর্ণা দেয় বাধ্য হয়েই। যদি সে না যায়, তাহলে এক তরফা ডিক্রি হয়ে তার হক্ব নষ্ট হয়ে যাবে। (মোদ্দা কথা হলো-সমাজ ব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে বাদী বা-বিবাদী কে আদালতের শরনাপন্ন হতে হয়-অনুবাদক)।

ইংরেজদের অধীন বর্তমান হিন্দুস্থানের বিচারালয়ে যাওয়া ও বিচার প্রার্থনা করা যদি কুফরী হয়, তাহলে তো শুধু হিন্দুস্থান কেন- সারা দুনিয়ার মুসলমানই কাফের হয়ে যাবে? কেননা, বর্তমানে (আ'লা হযরতের যুগে) দুনিয়ার কোথায়ও কোরআন সুন্নাহর আইন নেই। তাহলে তো সবাই কাফের বলে বিবেচিত হবে। এটা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার তো নিজেরাই অনেক আইন তৈরী করছে এবং এই আইন দ্বারাই ফৌজদারী আদালত চালাচ্ছে। এসব আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বা তর্কের জোরে হক্বকে নাহক্ব এবং নাজায়েযকে জায়েয প্রমাণ করা যায়।

এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গুনাহ্‌কে যে কুফরী বলবে, সে নিজেই কাফের। (খারেজী, মৌদূদী ও ওহাবীরা গুনাহ্‌কে কুফর মনে করে। সুতরাং যায়েদের উক্তিও কুফরী- অনুবাদক)।

আর সূরা নিসার উক্ত আয়াতের প্রকৃত মর্ম হলো-যারা শরিয়তী আইনকে বাতিল মনে করে ও ইংরেজদের আইনকে ভাল মনে করে- তারা মুসলমান নয়। আর ঐ আইন যদি সরাসরি শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ও পরীপন্থী হয়, আর এই ব্যক্তি আনন্দচিত্তে তাকে ভাল মনে করে, তাহলেই কাফের হবে- নতুবা নয়।

এটা শুধু মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নয়-বরং সমস্ত ইবাদতের বেলায়ও প্রযোজ্য। ধরুন-গরমের দিনের রোযা এবং শীত মৌসুমের এশা ও ফজরের নামায আদায় করতে নাফসে আম্মারা বাধা দেয়। এতে সে কাফের হবেনা- বরং গুনাহ্‌গার হবে। সে যদি সমস্ত ইসলামী আইন কানুনকে সত্য মনে করে- কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় তা পালন করেনা, তাহলে গুনাহ্‌গার হবে- কিন্তু কাফের হবে না। নামায রোযাকে যদি ঘৃনা করে, তাহলেই কাফের হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর পরবর্তী আয়াতটি বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করে দিয়েছে। আল্লাহ্পাক পূর্ববর্তী আয়াতে বলেছেন-"আমি যদি তাদেরকে নির্দেশ দেই যে, তোমরা একে অন্যকে মারো অথবা যদি বলি- তোমরা ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যাও, তাহলে অল্প লোকই তা মানবে"। (সূরা নিসা-৬৬)।

বুঝা গেল- আল্লাহর নির্দেশ পালন না করা অবাধ্যতার প্রমান নয়- বরং কষ্টকর হওয়ার কারনেই উক্ত নির্দেশ অনেকেই পালন করছেনা। এটা কুফরী নয়, বরং গুনাহ। সাহাবায়ে কেরামদের নিকট ঈমান ছিল প্রিয় এবং কুফর ও গুনাহ ছিল অপ্রিয়। তাই তাঁরা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যেরা তেমন নয়। যায়েদের কুটযুক্তিতে বুঝা যায়-সে নিজেই নিজের কুফরী স্বীকার করে নিচ্ছে। সে নির্ঘাত কাফের। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

مُسْلِمٌ قَالَ اَنَا مُلْحِدٌ-يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُ كُفْرٌ لَا يُعْتَذَرُ بِهٰذَا-

অর্থাৎঃ "কোন মুসলমান যদি বলে, আমি মুলহিদ- তাহলে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি বলে- আমি জানিনা যে, একথা বললে কাফের হয়ে যায়, তাহলেও কাফের হবে। তার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। সে কাফের বলেই গণ্য হবে"।

ছাওয়াল-৩২ ঃ মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে কিনা?

জওয়াব ঃ এ ব্যাপারে দুই প্রকারের হাদীস আছে। এক হাদীস মোতাবেক শুধু ঘনঘন কবর যিয়ারতকারিনীর উপর আল্লাহ্পাক লা'নত করেছেন। অন্য হাদীস মোতাবেক সবার জন্য যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

প্রথম হাদীস হলো- لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ-

অর্থাৎ ঃ "ঘনঘন ও বেশী বেশী যিয়ারতকারিনীদের উপর আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন"।

দ্বিতীয় হাদীস হলো-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ-اَلَا فَزُوْرُوْهَا-

অর্থাৎ- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বারণ করতাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করতে থাকো"। (মিশকাত)

শেষোক্ত এ হাদীস সম্পর্কে মোহাদ্দেসীন কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো-"নারী পুরুষ সবার জন্যই কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে"। (বাহরুর রায়েক)।

কিন্তু যুবতী মহিলাদের বেলায় নিষিদ্ধ রয়ে গেছে- যেভাবে যুবতীদের বেলায় মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেলে কবর যিয়ারত করতে গিয়ে মহিলারা যদি শোকে কাতর হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতে গিয়ে যদি আদবের খেলাফ করা হয় কিংবা শরিয়তের সীমা লংঘন করা হয়, তাহলেও সম্পূর্ন নিষেধ। অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদের জন্য জায়েয। কিন্তু শর্ত পূরণ হওয়া আজকাল প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়েছে- এ জন্যই সাধারণভাবে নিষেধ। গুনিয়া নামক গ্রন্থে এসব কারনে মহিলাদের জন্য যিয়ারতে গমন করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।

[হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রত্যেক বৎসরেই মক্কায় এসে আপন ভাই আবদুর রহমানের মাযার যিয়ারত করতেন-অনুবাদক]।

তবে মদিনা মোনাওয়ারার ব্যাপারটি উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। ওনার ক্ষেত্রে ভিন্ন হাদীস রয়েছে। রওয়া মোবারক যিয়ারত করা নারী পুরুষ সবার জন্য বরং সুন্নত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "নারী পুরুষ নির্বিশেষে যারা আমার রওযা যিয়ারত করবে-তাদের জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব।" সুতরাং মহিলাদেরকে নিষেধ করা যাবে না। আদব শিক্ষা দিতে হবে। (আহকামুল মাযার দেখুন- হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)- নিয়মিত ভাবে যিয়ারত করতেন-এম.এ. জলিল)।

ছাওয়াল-৩৩ ঃ এক মহিলার স্বামী বর্তমান আছে। তার ঘরে এক ছেলে সন্তানও আছে। মহিলার খারাপ চালচলনের কারনে স্বামী বললো- এই ছেলেটি আমার নয়-বরং হারামী। তার কথা গ্রহনযোগ্য হবে কিনা?

জওয়াব ঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে জন্ম নেয়া সন্তানকে হারামী বলা নাজায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-
اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ-

অর্থাৎঃ "সন্তান আইনতঃ বিছানার মালিকের- অর্থাৎ স্বামীর।"
এমন কি-বিবাহের পর ছয়মাসের কম সময়েও যদি সন্তান হয়, তাহলে বুঝতে হবে- গোপনে এই ব্যক্তিই জন্ম দিয়েছে। সুতরাং সন্তান তারই হবে- যদিও হারাম পন্থায় জন্ম হয়েছে। পূর্ন বৈধ সন্তান তখনই হবে- যখন বিবাহের ছয়মাস পরে জন্ম গ্রহন করে।

স্ত্রী যদি বলে-বিবাহের ছয়মাস পরে সন্তান জন্ম হয়েছে, আর স্বামী বলে ছয়মাসের পূর্বে- এমতাবস্থায় স্ত্রীর কথাই আইনতঃ গ্রহণযোগ্য। স্বামী যদি স্বাক্ষীও পেশ করে-তবুও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবেনা। দোররে মুখতারে এব্যাপারে উল্লেখ আছে-
وَلَدَتْ فَاخْتَلَفَا فِى الْبَدَاءَةِ فَقَالَتْ نَكَحْتَنِىْ مُنْذُ نِصْفِ حَوْلٍ وَادَّعَى الْاَقَلَّ فَالْقَوْلُ لَهَا وَالْوَلَدُ مِنْهُ-

অর্থাৎঃ- "সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এ বিষয়ে- 'সন্তান কখন থেকে গর্ভে আসলো'? স্ত্রী বললো ছয়মাস হয়ে গেছে- তুমি আমাকে বিবাহ করেছো। আর স্বামী বললো- না, ছয়মাস হয়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর কথাই আইনতঃ গ্রহণযোগ্য এবং সন্তান পিতার বলে গন্য হবে"। (দোররে মোখতার)।
(এই ফতোয়া তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-যাদের বিবাহ রেজেষ্ট্রি হয়নি-জলিল)

আর একটি সুরত হলো- স্বামী যদি দাবী করে- এই সন্তান অন্যের, আর স্ত্রীও তা স্বীকার করে-তাহলে তাদের উভয়ের কথাই বাতিল বলে গন্য হবে। কেননা, বংশ পরিচয় সন্তানের জন্মগত অধিকার। তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ছাওয়াল-৩৪ ঃ হারামী বা অবৈধ পাত্র-পাত্রী বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু বা সমান সমান বলে গন্য হবে কিনা? অর্থাৎ- পাত্র-পাত্রী সমপর্যায়ের হবে কিনা? আর হারামী ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবে কিনা?

জওয়াব ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে জারজ পাত্র বা পাত্রী সমপর্যায়ের হবেনা বা কুফু হবে না। তার ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী হবে- যদি এলেম ও মাছায়েলে অন্যান্যদের তুলনায় কম হয়।

ছাওয়াল- ৩৫ ঃ বিবাহ পড়াবার সময় কয়েকজন মহিলা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিল। তারা পাত্রপাত্রীর ইজাব ও কবুল শুনেছে। এতে কি বিবাহ দুরস্ত হবে?

জওয়াব ঃ স্বাক্ষী হিসাবে শুধু মহিলা থাকা জায়েয হবেনা। সাক্ষী হিসাবে দুজন মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার উপস্থিতি আবশ্যক। এটা শর্ত। তারা পাত্র ও পাত্রীর ইজাব ও কবুল শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, তারা উভয়ে রাজি হয়েছে এবং পরস্পরকে গ্রহন করেছে। অমুসলমানের সাক্ষী হওয়া দুরস্ত নেই। উপস্থিত সাক্ষী ছাড়াও বিবাহ দুরস্ত নেই। আর শত শত পুরুষের সামনেও যদি এমন ভাষায় ইজাব-কবুল হয়- যা তাদের বোধগম্য হয় না, তাহলেও বিবাহ দুরস্ত হবে না- যদিও পরে ঘোষনা করা হয় যে, বিবাহ হয়েছে। দোররে মোখতার গ্রন্থে স্বাক্ষীর ব্যাপারে বলা হয়েছে-
شُرِطَ حُضُوْرُ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ اَوْحُرٍّ وَّحُرَّتَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ - سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا- فَاهِمَيْنِ اَنَّهُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ-

অর্থাৎ "দুজন স্বাধীন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থেকে ইজাব-কবুল শুনা শর্ত। অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুজন স্বাধীন মহিলা- যাদের উপর শরিয়তের বিধান জারী আছে, তাঁরা পাত্র-পাত্রীর ইজাব-কবুল একসাথে শুনতে হবে। বুঝতে হবে যে, দুজন মুসলমান পাত্র পাত্রীর মধ্যে বিবাহ হচ্ছে"। (দোররে মুখতার)।

এসব শর্ত পূরন না হলে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে মিলন হলে তা হারাম ও গুনাহ্ হবে এবং সন্তান হলে হারামের পয়দা হবে। কিন্তু যেনার সন্তান বলা যাবেনা। সন্তান তাদেরই হবে। এ প্রসঙ্গে দোররে মুখতারে উল্লেখ আছে-
يَجِبُ مُهْرُ الْمِثْلِ فِىْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَهُوَالَّذِىْ فُقِدَ شَرْطٌ مِّنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ كَشُهُوْدٍ بِالْوَطْئِ-

অর্থাৎ "নিকাহে ফাসেদের ক্ষেত্রেও মোহরে মিছাল ওয়াজিব হবে। নিকাহে ফাসেদ বলা হয় ঐ বিবাহকে- যে বিবাহে শর্ত সমূহের মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়। যেভাবে মিলনের সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে ঐ বিবাহকে ফাসেদ বিবাহ বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-৩৬ ঃ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীমিলন জায়েয কিনা? শরীয়তের আদালত এব্যাপারে কি বলে?

জওয়াব ঃ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীমিলন জায়েয। এব্যাপারে পূর্বেকার নিষেধাজ্ঞা মূলক হাদীস মনছুখ হয়ে গেছে।

ছাওয়াল-৩৭ ঃ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে একত্রে বসবাস করে, কিন্তু তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহের কোন প্রমান নেই। লোকে তাদেরকে স্বামী স্ত্রী হিসাবেই জানে। এই প্রচারই কি যথেষ্ঠ?

জওয়াব ঃ শুধু প্রচারই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতির জন্য যথেষ্ঠ। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া মহল্লার মানুষের জন্য জায়েয। কেননা, এমনও হতে পারে যে, অন্যখানে তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়েছে। ইহা তো একটি সামাজিক ব্যবস্থা। তবে শরিয়ত মোতাবেক বিবাহ শাদী না হয়ে থাকলে তারা আল্লাহর নিকট স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গন্য হবে না। (হেদায়া,দুররে মোখতার-প্রভৃতি)।

ছাওয়াল-৩৮ ঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়ে এবং বালেগ ছেলে-মেয়ের বিবাহে তাদের সম্মতি লাগবে কিনা? যদি অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বাক্ষীগণের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে কিনা?

জওয়াব ঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়ে হলে ওলীর সম্মতি প্রয়োজন এবং সাবালেগ ছেলে-মেয়ে হলে তাদের নিজস্ব সম্মতি লাগবে। উভয় ক্ষেত্রেই দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। যদি নাবালেক ছেলে-মেয়ের বিবাহ ওলীর সম্মতি ছাড়া অন্যে পড়ায়, অথবা বালেগ ছেলে মেয়ের বিবাহ যদি ওলী তাদের সম্মতি না নিয়ে নিজে পড়ায়, তাহলে নাবালেগদের ক্ষেত্রে ওলীর সম্মতি এবং বালেগদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অনুমতি সাপেক্ষ বিবাহ স্থগিত থাকবে। ওলীর অথবা পাত্র-পাত্রির সম্মতি পাওয়া গেলেই বিবাহ শুদ্ধ বলে গন্য হবে এবং তারা একত্রে ঘর সংসার করতে পারবে।

নিম্ন বর্ণিত ৫টি প্রশ্নের উত্তর কি হবে?

(ক) একটি ছোট কিতাবে লিখা আছেঃ মে'রাজের রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ) নিজের কাঁধে করে আরশে মোয়াল্লায় পৌছিয়ে দিয়েছিলেন বা

কাঁধে করে উপরে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ- উর্দ্ধগমনকালে বোরাক, জিব্রাঈল ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ংসম্পূর্ন ছিলেন না- বরং গাউসে পাক (রাঃ)-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল।

(খ) রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি এরশাদ করেছেন- "আমার পরে যদি কেউ নবী হতো- তাহলে পীরানপীর আবদুল কাদির জিলানীই নবী হতো"।

(গ) হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) নাকি মালাকুল মউতের থলে থেকে কবজকৃত রূহসমূহ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং যার যার রূহ তাদেরকে ফিরত দিয়েছিলেন?

(ঘ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নাকি হযরত বড়পীর (রাঃ) সাহেবের রূহকে দুধপান করিয়েছিলেন?

(ঙ) অধিকাংশ আমলোকের বদ্ধমূল ধারণা এই যে-হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকেও বড়পীর সাহেবের মর্তবা বেশী? এ গুলোর জবাব কী?

জওয়াব ঃ এই ফকির (ইমাম আহমদ রেযা) সংক্ষিপ্ত- অথচ উপকারী কিছু কথা বলবো- যদিও তা আমার সমর্থনকারী ও বিরূদ্ধবাদী- উভয় গ্রুপের কাছেই পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু আশা করি, তা ইনসাফের সীমাও অতিক্রম করবেনা। সত্য অনুসরন করাই উচিত এবং আল্লাহ-ই সঠিক রাস্তার পথ প্রদর্শনকারী।

(খ) -এ বর্ণিত দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়েই শুরু করিঃ "নবীজীর পরে নবী আগমনের সম্ভাবনা থাকলে নিশ্চিতভাবে বড়পীর সাহেবই হতেন"- এই শর্তযুক্ত বানী বা নবী হওয়ার যোগ্যতার কথাটি হযরত বড়পীর সাহেবের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, এমন শর্তযুক্ত কথা হযরত ওমর (রাঃ) -এর বেলায়ও ছিল। এটা যোগ্যতার প্রশ্ন-সম্বাবনাময়। বাস্তবে তা হওয়া জরুরী নয়। হযরত বড়পীর সাহেবের মর্তবা ও পদমর্যাদা ছিল নবুয়তের পদমর্যাদার ছায়া স্বরূপ। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) নিজেই বলেছেন যে, "আমার প্রপিতামহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে কদম তুলেছেন-সেখানেই আমি কদম রেখেছি; কিন্তু নবুয়তের কদম নয় (বরং বেলায়াতের কদম)। কেননা, সেখানে নবী ব্যতিত অন্য কারো

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিস্যা নেই"। (কাসিদা)।

নবী হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) এর বেলায়ও নিম্নলিখিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -

অর্থাৎ "আমার পরে নবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ওমরই হতো নবী"। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি-আকীকা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে)।

হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখ আছে- "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুয়তের দরজা খোলা থাকলে সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রাঃ) সিদ্দীক ও নবী হতেন" (ইবনে আছাকির এবং মাওয়ারদী-হযরত আনাছ ইবনে মালেক সূত্রে)।

অনুরূপভাবে ইবনে হাজর মক্কী (রাঃ) ফতোয়ায়ে হাদীসিয়ায় উলামাগনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন-"শরহে মোহায্যাব গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

لَوْجَازَ اَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ نَبِيًّا لَكَانَ اَبُوْمُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِىُّ

অর্থাৎ"এই উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্ যদি কাউকে নবী করে পাঠাতেন, তাহলে সেই যোগ্যতা ছিল শেখ আবু মোহাম্মদ জোওয়াইনীর মধ্যে"।

"সব হাদীস সত্য-কিন্তু সব সত্য কথা হাদীস নয়"। হাদীস হিসাবে গন্য করতে হলে তা অবশ্যই প্রমান ও সনদ ভিত্তিক হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে নবীজীর পৃথক কোন হাদীস প্রমানিত নেই সত্য- তবে কোন উলামা বা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন ওলী-আল্লাহ্ যদি ঐরূপ উক্তি করে থাকেন- তাহলে আবু মোহাম্মদ জোওয়াইনী সম্পর্কে উলামাগনের উক্তির ন্যায়ই তা বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) এ বর্ণিত চতুর্থ প্রশ্নের জবাব হলো ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক গাউসুল আযম (রাঃ) -এর রূহ্কে দুধ পান করানোর বিষয়টি হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) -এর ভক্তগনের স্বপ্নের ঘটনা। আমি (আহমদ রেযা) কোন কোন কিতাবে এরূপ পেয়েছি। স্বপ্নে হোক- বা জাগ্রত হোক-কেউ যদি কাশ্ফ্ দ্বারা এরূপ দেখে- তাহলেও সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা। কেননা, "কারামাতুল আউলিয়া হক্কুন"। তবে এই স্বপ্নের বা কাশ্ফের ঘটনা

নিয়ে পরবর্তীতে যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে- ঐগুলো বেহুদা কাজ। কেউ যদি দুধ পান করানোর ঘটনাটি কাশফের দ্বারা দেখে থাকেন- তাহলে সেটা এভাবে হতে পারে-"হযরত আয়েশা (রাঃ) মিছালী দেহ ধারণ করে রূহানী জগতে গাউসে পাককে দুধ পান করিয়েছেন"।

দেখুন, রূহানী জগতে শহীদগনের রূহ মোবারক পাখীর সূরতে সিদ্রাতুল মোন্তাহা ও বেহেস্তের ফল ভক্ষন করে থাকেন-একথা তো স্বয়ং হাদিসেই পাওয়া যায়। যেমন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- اِنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِىْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "রাসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- শহীদগনের রূহ সবুজ পাখীর সূরত ধারন করে জান্নাতী ফল ভক্ষন করে থাকে" (কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সূত্রে- ইমাম তিরমিজি)।

সাধারণ মোমেনগনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হাদীস এসেছে। যেমন- ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম জুহ্রী, আবদুর রহমান ইবনে কা'ব এবং হযরত কা'ব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُّعَلِّقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَهُ اِلٰى جَسَدِهٖ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ-

অর্থাৎ "মোমেনগনের রূহ পাখির সূরত ধারণ পূর্বক জান্নাতী ফল ভক্ষন করতে থাকবে। এই অবস্থায় চলতে থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তারপর তাদেরকে নিজ দেহে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্পাক হাশরে উঠাবেন"।

বুঝা গেলো- শহীদ ও মোমেনগনের রূহ পাখির সূরত ধারণ করে বেহেস্তী ফল ভক্ষন করে। তাহলে-গাউসুল আযমের রূহ যদি মা আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্য পান করে থাকেন বিশেষ সূরত ধারন করে- তাহলে এটাকেও অবাস্তব বলা যাবে না।

দেখুন, হাদীসে এসেছে-হুযুরের সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রাঃ) দুগ্ধপানরত অবস্থায় ১৬/১৭ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। নবী করিম (দঃ) বলেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ إِبْنِيْ فَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ ضَرَّيْنِ يُكْمِلاَنِ رِضَاعَتَهُ فِي الْجَنَّةِ۔

অর্থাৎ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- ইবরাহীম নিশ্চয়ই আমার পুত্র। সে দুধপান অবস্থায় শিশুকালে ইন্তেকাল করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য দুজন ধাত্রীমা নির্ধারিত করেছেন। তারা বেহেস্তে ইবরাহীমকে বাকী সময় দুধপান করিয়ে দু বৎসর পূর্ন করেছেন।" (ইমাম আহমদ ও মুসলিম- হযরত আনাছ (রাঃ) সূত্রে)

সুতরাং- রূহানী জগতে গাউসে পাককে দুধ পান করানোর বিষয়টিও অসম্ভব কিছু নয়- যদিও তা হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয়নি। হাদীস দ্বারা প্রমানিত না হলে পরিভাষায় তাকে বলা হয় "ভিত্তিহীন"- কিন্তু অসম্ভব বা মিথ্যা বলা হয় না। ইহা হাদীসের পরিভাষা।

(গ)-এ বর্ণিত তৃতীয় প্রশ্নের জবাব ঃ মালাকুল মউতের থলে থেকে রূহ কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গে- যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে- তাতে মনে হয়- হযরত আযরাইল আলাইহিস সালাম অনেক রূহ্ থলেতে ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন- আর বড়পীর সাহেব (রাঃ) জোর করে তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী। আযরাইল হলেন ফিরিস্তাদের মধ্যে রসূল শ্রেণীভূক্ত। আর হযরত বড়পীর (রাঃ) হলেন আউলিয়াদের সম্রাট। আকায়েদ বা ইসলামের মৌলিক নীতি অনুযায়ী-"মানুষ অলীর চেয়ে রাসুল জাতীয় ফিরিস্তারা উত্তম"। তদুপরি-আযরাইল (আঃ) হলেন শক্তিশালী ফিরিস্তা। তাঁর থেকে থলে ছিনিয়ে নেওয়া কি করে সম্ভব? এরূপ আক্বিদা পোষন করা বাতিল। (গাউসে পাককে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই মনগড়া কাহিনী ছড়ানো হয়েছে- জলিল)।

উপরের জবাব দেওয়া হয়েছে প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী। বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। হয়তো মূল ঘটনাটি এরূপ ছিল-

"হযরত আযরাইল আলাইহিস সালাম কিছু রূহ্ আল্লাহ্র নির্দেশে কব্জ করেছিলেন। কিন্তু গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্র হুকুমেই আযরাইল (আঃ) ঐগুলো ফিরত দিয়েছিলেন। এভাবে অনেক মূর্দাকে জিন্দা করার ঘটনা অনেক ওলী-আল্লাহ্র জীবনীতেও পাওয়া যায়। এটা স্বাভাবিক কারামত। ইসলামে পূনর্জীবন স্বীকৃত- (কিন্তু পূনর্জন্ম সম্পূর্ন শিরিকী আক্বিদা)।

এরূপ ঘটনাকে ছিনতাই-এর কাল্পনিক রূপ দিয়ে হযরত গাউসে পাকের প্রকৃত মর্যাদার উপর আঘাত হানা হয়েছে।

(হাদীস শরীফে আছে اَلْقَضَاءُ لَا يَرُدُّ اِلَّا بِالدُّعَاءِ۔ -অর্থাৎ- "তক্বদীর স্বাভাবিক নিয়মে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু কোন নবী বা অলীর দোয়ার বরকতে তক্বদীর পরিবর্তন হতে পারে।" (এটাকে আরবীতে "তাক্বদীরে মোয়াল্লাক" তদবীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তক্বদীর বলা হয়- এম.এ. জলিল)

অথবা- উক্ত ঘটনা এমনও হতে পারে যে, হযরত আযরাইল আলাইহিস সালাম খোদায়ী রেকর্ড অনুযায়ী দিন তারিখ মোতাবেক রূহ্ কবজ করা শুরু করেছিল-এমন সময় গাউছেপাক তাদের দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া করলেন। এমতাবস্থায় "তাক্বদীরে মোয়াল্লাক" (দোয়া) সূত্রমতে মালাকুত মাউত বিরত রইলেন, অথবা কব্জকৃত রূহ ফিরত দিলেন। অলীগনের এই মর্যাদাকে কেউ সার্বভৌম বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার রূপ দেয়ার চেষ্টা করাতে গাউসে পাকের শানে বানোয়াট কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। মূল ঘটনা ছিল দোয়ার দ্বারা হায়াত ফিরে পাওয়া- নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে নয়।

দোয়ার বরকতে মৃত্যুতে বিলম্ব হওয়া ঃ

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহর অলীগন কোন কোন লোককে বাঁচিয়ে দেওয়ার একটি ঘটনা হযরত সাইয়েদ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (রাঃ) তাঁর লিখিত لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ۔ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই-

"হযরত শেখ মুহাম্মদ শারবিনী (কুঃসিঃ)-এর পুত্র হযরত আহমদ অসুস্থ হয়ে খুবই কাহিল হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হলেন। হযরত আযরাইল আলাইহিস সালাম রূহ কব্জ করার জন্য তাঁর নিকট আসলেন। হযরত শেখ মুহাম্মদ শারবিনী (রাঃ) টের পেয়ে হযরত আযরাইলকে বললেন-"আপনি ফিরত চলে যান- কেননা, তাঁর তাক্বদীরের লেখা খন্ডন হয়ে গেছে"। একথা শুনে হযরত আযরাইল (আঃ) ফিরে গেলেন। শেখ মুহাম্মদ শারবিনী (রাঃ)-এর পুত্র শেখ আহমদ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। (তাক্বদীরে মোয়াল্লাক নীতি দেখুন। গাউসে পাক হলেন অলীকুল সম্রাট। তাঁর দোয়ায় হাজারো লোকের রূহ্ ফিরত দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়-অনুবাদক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঙ)-এ বর্ণিত ৫ম প্রশ্নের জবাবঃ যে ব্যক্তি বলবে- "হযরত গাউসে পাক (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চেয়েও উত্তম বা আফযল" সে গোমরাহ্ ও শিয়া বিদআতী সম্প্রদায়ের আক্বিদা পোষনকারী লোক হবে। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থী সকল ইমামগনের ঐক্যমত্য বা ইজমা হলো- হযরত আবু বকর (রাঃ) সার্বিক ফযিলতে শাহেনশাহে বেলায়াত হযরত মাওলা আলীর চেয়েও উত্তম। যারা এর বিপরীত কথা বলবে- সে রাফেজী ও শিয়া পন্থী। সুতরাং হযরত গাউসে পাক (রাঃ) কে হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে উত্তম বলা কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার পরিপন্থী।

আমি (মিসকিন আহমদ রেযা) মনে করি- হযরত গাউসে পাকের প্রতি আমার অবিচল মহব্বতের হক্ব আমি আদায় করেছি। তাতে তাঁর প্রাপ্য হক যথাস্থানে রেখেছি। গাউছে পাক (রহঃ) কে আযরাইলের উপর শক্তিশালী এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চেয়ে উত্তম বলা- এমন বাজে কথায় স্বয়ং গাউসে পাকই বেশী নারাজ হবেন।

(গাউসে পাক (রাঃ) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে নিজেই উল্লেখ করেছেন-"নবীগনের পরে সমস্ত মানব গোষ্টির মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বশ্রেষ্ট। ইহাই সঠিক ইসলামী ও সুন্নী আক্বিদা"-অনুবাদক)।

(ক)-এ বর্ণিত প্রথম প্রশ্নের জবাবঃ শবে মে'রাজে রাসূলে পাকের কদমের নীচে গাউসে পাকের রূহানী গ্রীবা রাখা এবং বোরাকে আরোহণ ও আরশ মোয়াল্লায় আরোহনের সময় বাহন বা সিড়ি হওয়ার বিষয়টি শরিয়ত ও বিবেক বিবেচনায় অসম্ভব বিষয় নয়। (যদি কেউ কাশ্ফ দ্বারা বলে থাকেন, তাহলে মানা যায়- অনুবাদক)।

সিদ্রাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত ভ্রমণের সময় শারিরীকভাবে (প্রতিকী শরীরে) গাউসে পাকের উপস্থিত থাকা অসম্ভব নয়। রূহানী ভ্রমন তো আরশ মোয়াল্লা বা তদুর্দ্ধেও হাজার হাজার আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায় প্রমানিত আছে। মুনকেরে দ্বীন ব্যতিত কোন মুসলমান তা অস্বীকার করবেনা। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে **"ওযু অবস্থায় শয়নকারী ব্যক্তির রূহ আরশ পর্যন্ত উড্ডীন করা হয়"**। (সিজদাকারীর বেলায়ও অনুরূপ হাদীস এসেছে-জলিল)

গাউসে পাকের রূহ মোবারক হুযুরের (দঃ) কদমের নীচে কাঁধ পেতে দেওয়া বা বোরাক ও আরশ মোয়াল্লায় আরোহনের সময় বাহন বা সিড়ি হওয়ার দ্বারা হুযুর (দঃ) থেকে অধিক উত্তম হওয়া প্রমানিত

হয়না। এটা নিছক ভুল ধারণা। কি আশ্চর্যের বিষয়- বোরাক হুযুর (দঃ) কে বহন করে নিয়ে যাওয়াতে যারা একথা ধারণা করে- তারা পরোক্ষভাবে বোরাকেরই প্রাধান্য দেয়। (মূলতঃ হুযুর (দঃ) মে'রাজ থেকে ফিরত আসার সময় বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিজে নিজেই এসেছিলেন। দেখুন- নূরনবীঃ মে'রাজ অধ্যায়-অনুবাদক)

বাদশাহ্ বা শাহানশাহের সম্মানের জন্য হাতীঘোড়া সাজানো হয়। তাতে চড়ে তিনি গন্তব্যস্থলে যান। এর অর্থ কি এই যে, তিনি নিজে যেতে অক্ষম? না, কখনই নয়। তদ্রুপ উর্দ্ধারোহনের বেলায় কেউ যদি বাহন বা সিড়ির দায়িত্ব পালন করে- তাহলে কি বলা যাবে যে, আরোহীর চেয়ে বাহনের ক্ষমতা ও মর্যাদা বেশী? না, কখনই নয়।

একটি উদাহরন দেখুন। বায়তুল্লাহ শরীফের মূর্তিগুলো ভাঙ্গার সময় যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীর অনুরোধে তাঁর কাঁধে উঠে নিজে মূর্তি ভাঙ্গতেন- তাহলে কি কোন বোকা একথা বলবে যে, হযরত রাসুল করীম (দঃ) ঐ কাজে অক্ষম ছিলেন-আর হযরত আলী ছিলেন সক্ষম? (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত গাউসে পাকের বেলায়ও এরূপ ধারণা করা অমূলক এবং যারা লিখেছেন- তাদের মনেও এরূপ ধারণা ছিলনা। প্রশ্নকারী নিজে মনগড়াভাবে এসব কথা সাজিয়েছে।

এতক্ষণ উপরে যা বলা হলো- তা ছিল নীতিগত কথা। ঐ ঘটনা নীতি বিরুদ্ধ নয় এবং অসম্ভব কিছুও নয়।

এখন আসুন, এই ঘটনার পিছনে কোন সত্যতা বা ইঙ্গিত আছে কিনা? আমি আমার প্রণীত "আল-আতায়া আন-নাবভিয়া ফি ফতোয়া রজভিয়া" গ্রন্থে উজাইনবাসী জনৈক ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম "মাছায়েলে শাত্তা" অধ্যায়ে। এখন এই " ইরফানে শরীয়ত" গ্রন্থে কিছু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বিস্তারিত বলছি -

গাউসেপাকের ঐ ঘটনাটির মূল ভিত্তি হলো- "কোন কোন মাশায়েখ নিজ নিজ গ্রন্থে ঐ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এই ঘটনাটি শরিয়ত অথবা বিবেক বিরোধী অসম্ভব ব্যাপারও নয়- বরং বুযর্গানে দ্বীনের ক্ষেত্রে রূহানীভাবে উর্দ্ধজগতে তাদের উপস্থিতির প্রমান বিভিন্ন হাদীসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং ওলী-আল্লাহ ও উলামাগনের মন্তব্যে পাওয়া যায়। যেমন-

(১) মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদ তায়ালিছি শরীফে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) সূত্রে এবং আবদ ইবনে হুমায়দ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন-নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেন-

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَاهٰذَا-فَقَالُوْا هٰذَا بِلَالٌ - ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ وَسَمِعْتُ خَشِيْعَةً فَقُلْتُ مَاهٰذَا - قَالُوْا هٰذَا لِغُمَيْصَةَ بِنْتِ مِلْحَانَ-

অর্থাৎ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মে'রাজের রাত্রে আমি এক জান্নাতে প্রবেশ করে পায়ে হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি নামাযের ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- এটা কিসের শব্দ? ফিরিস্তারা বললো-ইহা হযরত বেলালের পায়ের শব্দ। আমি আরেক জান্নাতে প্রবেশ করে অনুরূপ পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ফিরিস্তাদেরকে বললাম-এটা কি? তাঁরা বললো- এটা হলো গামিছা বিন্তে মিলহানের পায়ের শব্দ"। (মুসলিম, আবু দাউদ ও তাকরীব)।

(গামিছা বিনতে মিলহান হলেন হযরত আনাছ (রাঃ)-এর মায়ের নাম। উনার নাম উম্মে সোলায়ম। হযরত আনাছ (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যুর পর উম্মে সোলায়ম হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট দ্বিতীয় বিবাহ বসেন। সেই ঘরের দুই সন্তান যবেহ হয়েছিল এবং নবীজীর দোয়ার বরকতে পূনঃ জীবিত হয়ে হুযুরের সঙ্গে খানা খেয়েছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহর ইসলাম প্রসঙ্গ দেখুন! তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে নাঈমী, জাআল হক- প্রভৃতি দ্রষ্টব্য-অনুবাদক)। উনার ইনতিকাল হয়েছিল হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফত যুগে।

(২) ইমাম আহমদ একটি হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে এবং আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ-فَسَمِعْتُ فِىْ جَانِبِهَا وَجْسًا فَقُلْتُ يَا جِبْرَائِيْلُ مَاهٰذَا - قَالَ هٰذَا بِلَالُ الْمُؤَذِّنُ-

অর্থাৎ "আমি জান্নাতে প্রবেশ করে এক কোনায় একটি পায়ের নরম শব্দ শুনতে পেয়ে জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম- এটা কার পায়ের

আওয়াজ? জিবরাইল বললেন- এটা আপনার মোয়াযযিন হযরত বিলালের পায়ের আওয়াজ"। (তাক্বরীব)।

৩। ইবনে ছাআদ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে আবু বকর আদবী থেকে মুরছাল হাদীস বয়ান করেছেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ نَخْمَةً مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَرْدِىِّ-

অর্থাৎ "আমি জান্নাতে প্রবেশ করে নোয়াইম ইবনে ওয়ারদীর গলার কাশির শব্দ শুনতে পেয়েছি"। (তাবাকাতে ইবনে ছাআদ)।

এই কারনে তাঁর উপাধী হয়েছিল "কাশির শব্দকারী"। তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফত যুগে আজনাদীর যুদ্ধে শহীদ হন।

সুবহানাল্লাহ! সহীহ হাদীস দ্বারা এসব জীবিত লোকদেরকে জান্নাতে উপস্থিত পাওয়া যেখানে প্রমানিত- সেখানে রূহের জগতের কিছু রূহ যদি মিছালী বা প্রতিকী শরীর ধারন করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে থাকেন-সেটাকে অসম্ভব বলবো কিভাবে?

(৪) আরো শুনুন-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِرَجُلٍ مُغَيَّبٍ فِىْ نُوْرِالْعَرْشِ - قُلْتُ مَنْ هٰذَا - اَمَلَكٌ؟ قِيْلَ لَا - قُلْتُ نَبِىٌّ ؟ قِيْلَ لَا - قُلْتُ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ هٰذَا رَجُلٌ كَانَ فِى الدُّنْيَا لِسَانُهٗ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَقَلْبُهٗ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُسِبَّ لِوَالِدَيْهِ-

অর্থাৎ "মি'রাজ রজনীতে আমি এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। সে আরশের নূরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এই ব্যক্তি কি ফিরিস্তা? বলা হলো- না। আমি বললাম- তাহলে নবী? বলা হলো-না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম- তাহলে ইনি কেমন ধরনের লোক? ফিরিস্তা আরয করলো-ইনি এমন এক ব্যক্তি- যিনি দুনিয়াতে সব সময় আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা স্বীয় জিহ্বাকে সিক্ত রাখতো তার অন্তর মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকতো এবং নিজের পিতামাতাকে অপরের দ্বারা গালমন্দ শুনাতোনা" (ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক আবুল মাখারিক সূত্রে বর্ণিত হাদীস)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহঃ) -এর কথা ঃ
আপনি এতদূর হতে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাচ্ছেন কেন? কাদেরিয়াতের ফয়েযদাতা (আ'লা হযরত) জোশে এসেছে। হাদীসের মহাসমূদ্র হতে আপনার কাংখিত মনিমুক্তা এবার আহরণ করতে থাকুন-

(১) মশহুর মোহাদ্দেসীন কেরামের বর্ণিত মরফু হাদীসে ইঙ্গিত এসেছে-"মে'রাজ রজনীতে হুযুর সাইয়েদিনা গাউসুল আযম রাদিয়াল্লাহু আন্হু রূহানী জগতে আপন মুরিদগন, সাথী সঙ্গীগন ও ভক্ত গোলামগন সহ আকাশে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়েছিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহযাত্রী হয়ে বায়তুল মামুরে পৌছে ছিলেন। শুধু তাই নয়- হুযুর পূরণুরের (দঃ) পিছনে তিনি নামাযও আদায় করেছিলেন। নামায শেষে বাইতুল মামুর থেকে বাহির হয়ে এসেছিলেন।

সংকীর্ণদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এখন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতে পারে- এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? হাঁ,কিভাবে সম্ভব হয়েছিল- তা আমার কাছে শুনুন।

(২) ইবনে জারীর তারারী, ইবনে আবি হাতেম, বাজজার, আবু ইয়ালা, মারদুওয়ায়, বায়হাকী, ইবনে আছাকির- প্রমূখ মশহুর মোহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে পবিত্র মে'রাজের উক্ত বিষয়ের দীর্ঘ মরফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসখানা হলো-

ثُمَّ صَعَدْتُ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاِذَا اَنَا بِاِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ مُسْنِدًا ظَهْرَهٗ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ (فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ) وَاِذَا بِاُمَّتِىْ شَطْرَيْنِ- شَطْرٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ كَاَنَّهَا الْقَرَاطِيْسُ- وَشَطْرٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رَمَدٌ - فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ وَدَخَلَ مَعِىَ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ الْبِيْضُ وَحُجِبَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ الرَّمَدُ وَهُمْ عَلٰى خَيْرٍ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَمَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْبَيْتِ- ثُمَّ خَرَجْتُ-

অর্থাৎ হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন-"আমি ষষ্ঠ আসমান ভ্রমন শেষে সপ্তম আসমানে আরোহন করলাম। হঠাৎ করে আমি দেখতে পেলাম- হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল মামুরের দেওয়ালে পিঠ হেলান দিয়ে বসে আছেন। (দীর্ঘ বর্ণনার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) এরপর আমার দুই প্রকারের উম্মতকে সেখানে উপস্থিত পেলাম। একদলের পোষাক সাদা ধবধবে, আরেক দলের পোষাক কিছুটা ময়লা। আমি বাইতুল মামুরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার সাথে ধবধবে সাদা পোষাকধারী উম্মতেরাও প্রবেশ করলো-

কিন্তু ময়লা পোষাকধারীদেরকে বারন করা হলো-কিন্তু তারাও উত্তমই ছিল। অতঃপর আমি ও আমার সাথী সাদা পোষাকধারী উম্মতেরা বাইতুল মামুরে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আমরা বের হয়ে আসলাম"। (ইবনে জরির তাবারী, ইবনে আবি হাতেম, বাজজার, আবু ইয়ালা, মারদুয়ায়, বায়হাকী, ইবনে আছাকির-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সূত্রে)

-এখন পরিষ্কার হয়ে গেলো-শবে মে'রাজে সমস্ত উম্মতই সপ্তম আকাশে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ধন্য হয়েছিল। তবে এক অংশকে বাইতুল মামুরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল-অন্য দলকে বারন করা হয়েছিল।

এখন আপনারাই বলুন- হযরত গাউসেপাক এবং তাঁর প্রিয় মুরিদ, সাথী ও গোলামগণ কোন্ দলে ছিলেন? নিশ্চয়ই সাদা পোষাকধারীদের দলে ছিলেন-তাঁরা হুযুরের ইমামতিতে বাইতুল মামুরের নামাযে শরিক হয়েছিলেন। এখন কোথায় গেলো অজ্ঞ জাহেলদের এই উক্তি- "সেখানে গাউসে পাকের যাওয়া কি সম্ভব"?

আজকাল স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী কিছু মুফতী নামধারীরাই এরূপ উক্তি করে থাকে। এখন তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। বাইতুল মামুরে গমন করা যদি গাউসে পাকের জন্য সম্ভব হয়- তাহলে হুযুরের কদমের নিচে কাঁধ পেতে আর একটু উপরে যাওয়া অসম্ভব হবে কোন্ যুক্তিতে?

তরিকতের মাশায়েখগনের বর্ণনা কি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে? তাঁরা তো কাশ্‌ফ দ্বারা অবলোকন করেই কাঁধে আরোহনের ঘটনা লিখেছেন!

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) আরেফ বিল্লাহ্ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাঃ) বলেছেন-

لوح محفوظ است پیش اولیاء- انچه محفوظ است محفوظ ازخطا-

"অলীগনের দৃষ্টি তো লওহে মাহফুজে নিবদ্ধ। তাঁদের দৃষ্টি ভ্রমদোষ হতে পবিত্র।" (তাঁদের এই সত্যদর্শন হাদীস না হলেও মিথ্যা নয়- অনুবাদক)।

কেউ বলতে পারেন- গাউসে পাকের ঘটনাটি তো কোন হাদীসের সনদ দ্বারা প্রমানিত নয়। জবাব হলো- ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য হাদীসের সনদ প্রয়োজনীয় নয়- কাশফই যথেষ্ট।

(৪) এপ্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতি (রাঃ)-এর একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত শরীফের পর হযরত ওমর (রা)-একটি "শোকগাথা" (মর্সিয়া) লিখেছিলেন- যার শুরু ছিল এরূপ-

بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ-

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কোরবান হোক"।

ঐ মর্সিয়া কালামের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি তাঁর "মানাহিলুস সাফা ফী তাখরীজে আহাদিছিশ শিফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

لَمْ اَجِدْہُ فِیْ شَیْءٍ مِّنْ کُتُبِ الْاٰثَارِ وَلٰکِنَّ صَاحِبَ اِقْتِبَاسِ الْاَنْوَارِ وَابْنَ الْحَاجِّ فِیْ مَدْخَلِہٖ ذَکَرَاہُ فِیْ ضِمْنِ حَدِیْثٍ طَوِیْلٍ - کَفٰی بِذَالِکَ سَنَدًا لِمِثْلِہٖ فَاِنَّہٗ لَیْسَ مِمَّا یَتَعَلَّقُ بِالْاَحْکَامِ-

অর্থাৎ "সুয়ুতি (রহঃ) বলেন- রাসুলে পাকের ইনতিকাল উপলক্ষে হযরত ওমর (রাঃ)-এর রচিত মর্সিয়া কালাম বা শোকগাথাটি আমি কোন হাদীস গ্রন্থে বা সাহাবাগনের রেওয়ায়াতকৃত কোন বর্ণনায় পাইনি। তবে "ইক্তিবাছুল আনৃওয়ার" গ্রন্থপ্রনেতা এবং ইবনুল হাজ্ব তাঁর "মাদখাল" গ্রন্থে এক বিরাট হাদীসের প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন। যেকোন সনদের অধিন পাওয়া যাওয়াই গ্রহনের বেলায় যথেষ্ট। কেননা ইহা শরিয়াতের আহ্কাম জাতীয় কোন বিষয় নয়- বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র"। (মানাহিলুস সাফা)। (হযরত গাউসে পাকের ঘটনাটিও তদ্রুপ রূহানী জগতের ঘটনা-অনুবাদক)

আমি (ইমাম আহমদ রেযা) কার কাছে এই কথাটি বলবো যে- "হযরত মাশায়েখীনে কেরামগনের বাতেনী এলেম হাদীসের বাহ্যিক সনদ- "হাদ্দাসানা ও আখবারানা" পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-বরং তাঁদের কাছে এর চেয়েও উন্নত ধরনের হাজার হাজার উপায় উপকরন (কাশ্ফ) আছে-যার মাধ্যমে তাঁরা সত্য উদঘাটন করতে পারেন। অতএব, মাশায়েখগনের ব্যাপক এলেমের তুলনায় যাদের এলেম হাজার ভাগের একভাগও হবে না-তারা কি করে অলীআল্লাহগন কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাবলীকে অস্বীকার করতে পারে? ইহা কি বে-ইনসাফী কথা নয়? মানুষের সৌভাগ্য তো নির্ভর করে ঐসব মাকাম ও মাআরেজ অতিক্রমের উপর। সত্য স্বীকার করার উপরই তো ইসলাম নির্ভরশীল! মিথ্যারোপ ও অস্বীকৃতিই ধ্বংসের মূল কারণ। (আলহামদু লিল্লাহ)।

মোদ্দা কথা হলো- উপরে বর্ণিত বাইতুল মামুর ও অন্যান্য ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস সমূহ স্বীকার করে নিতে কোন বাধা নেই-না যুক্তিভিত্তিক-না শরিয়ত ভিত্তিক। বড়পীরের উক্ত ঘটনা হাদীসে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও ইঙ্গিতে আছে এবং মাশায়েখগনের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। ওনাদের বাতেনী বর্ণনা বাহ্যিক সনদের মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাধীন সর্ববিষয়েই শক্তি রাখেন। আদব রক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত।

ছাওয়াল-৪৪ঃ ইমামত কি মিরাছী সত্ব? কোন ইমামের মৃত্যুর পর কি তার পুত্র বা খান্দানের কেউ ঐ ইমাম পদের হক্বদার? অন্য ইমাম নিযুক্ত হলে এরা বাধা দেয়। এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কি?

জওয়াব ঃ ইমামতির ক্ষেত্রে মিরাছী সত্ব নেই। কারণ, মিরাছী স্বত্বের অর্থ হলো-পিতার মৃত্যুর পর তার সমস্ত আওলাদগনই উক্ত পদলাভের হক্বদার। তাহলে দেখা যাবে-ছেলেরা পাবে ইমামতির দুই অংশ, মেয়েরা পাবে এক অংশ এবং স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান থাকলে সেও ইমামতির ভাগ পাবে। বিষয়টি খুবই হাস্যকর। খান্দানী মিরাছ হয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে। ইমামতির ক্ষেত্রে কি করে সম্ভব? বুঝা গেলো- ইমামতির ক্ষেত্রে মিরাছী স্বত্ব নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাওয়াল-৪৫ ঃ ইমামতি কি আলেমদের হক্ব-নাকি মূর্খদের?

জওয়াব ঃ মূল ইমামত হলো-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। কেননা, তিনি আপন উম্মতের ইমাম। আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম আলইহিস সালামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন-

اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا-

"হে ইবরাহীম! আমি তোমাকে লোকের ইমাম (নবী) বানালাম"।

আমাদের প্রিয়নবী তো হলেন সকল নবীগনের ইমাম এবং অন্যান্য ইমামগনেরও ইমাম। প্রত্যেক বিবেকবান লোকই জানেন যে, যেখানে মূল উপস্থিত না থাকেন, কেবল সেখানেই অধীনস্থ কেউ ইমাম হতে পারে-অন্য কেউ নয়। আর সমস্ত মুসলমানই জানেন যে, আলেমগনই নবীজীর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি- মূর্খরা নয়। কাজেই যেখানে আলেম পাওয়া যাবে-সেখানে জাহেলরা ইমাম হতে পারবেনা এবং দাবীও করতে পারবেনা। ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

اَلْاَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ تَقْدِیْمًا اَعْلَمُهُمْ بِاَحْکَامِ الصَّلٰوةِ-

অর্থাৎ "নামাযের মাসআলায় বেশী জ্ঞানী ব্যক্তিই ইমামতির ক্ষেত্রে বেশী হক্বদার এবং অগ্রাধিকারী"।

ছাওয়াল-৪৬ ঃ ইমামতির জন্য বেশী হক্বদার যদি আলেমগন হন- তাহলে যারা গায়ের জোরে তাকে উপেক্ষা করে জাহেল লোককে ইমাম বানায়, অথবা বানাতে চায়-শরিয়ত মতে তারা অভিযুক্ত হবে কিনা?

জওয়াব ঃ আলেম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা জাহেলকে ইমামতি দিতে চায়, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্- রাসুল এবং পবিত্র শরিয়তের বিরোধী। হাকেম, ওকায়লী, তাবরানী, ইবনে আদী, খতীবে বাগদাদী- প্রমূখ মোহাদ্দেসগন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে-

مَنْ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِّنْ عَصَابَةٍ وَفِیْهِمْ مَنْ هُوَ رَضِیَ اللّٰهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالْمُؤْمِنِیْنَ-

অর্থাৎ-"যারা আপনজনকে কাজে নিযুক্ত করে, অথচ তাদের মধ্যে এমন লোক আছে- যার প্রতি আল্লাহ্ রাযী- তাহলে আল্লাহ্- রাসুল এবং মুমিন সকলের সাথেই তারা খেয়ানত করলো"। (হাকেম প্রমূখ)।

ছাওয়াল-৪৭ হাদীস শরীফে আছে-تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ کُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ- অর্থাৎ "নেককার ও গুনাহ্গার নির্বিশেষে সকলের পিছনেই নামায পড়া দুরস্ত"। এই হাদীসকে অবলম্বন করে কেউ যদি আলেমের পরিবর্তে মূর্খ জাহেলকে ইমাম বানান, তাহলে শুদ্ধ হবে কিনা?

জওয়াব ঃ খেলাফতের পর যখন রাজতন্ত্র শুরু হলো, তখনও বাদশারা ইমামতি করতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয় অবগত ছিলেন বিধায় জানতেন যে, এদের মধ্যে নেককার এবং বদকার- উভয় ধরনের লোকই হবে। হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন- سَتَکُوْنُ عَلَیْکُمْ اُمَرَاءُ یُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ-

অর্থাৎ "অদুর ভবিষ্যতে এমন কিছু শাসক হবে- যারা সঠিক ওয়াক্তের পরে নামায আদায় করবে"।

তিনি একথাও জানতেন যে, এসব শাসকদের বিরোধিতা করলে ফিতনার আগুন জ্বলে উঠবে। তাই তিনি শাসকদের ফিতনা বন্ধ করার লক্ষ্যেই উক্ত হাদীসে তাদের ইমামতির অনুমতি দিয়েছেন, এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কৌশলী ব্যবস্থা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- "ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও মারাত্মক"।

হুযুরের হাদীস খানা এই রকম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে অপ্রকাশ্য ফাছেকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তানযিহী এবং প্রকাশ্য ফাজের ব্যক্তির পিছনে মাকরূহে তাহরীমী অবশ্যই হবে।

যারা সাধারন ইমামতির বেলায় এই হাদীস ব্যবহার করতে চায়- তাদের জন্য তা জায়েয হবেনা। মাকরূহে তানযিহীর সাথে নামায জায়েয হওয়া এক কথা-আর পূর্ন বিশুদ্ধ হওয়া আরেক কথা। মুত্তাকী ইমাম আর ফাজের ইমাম কি এক সমান? ফুকাহায়ে কেরাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন- ইমামতির জন্য বেশী হক্বদার হলেন নামায বিষয়ক এলেমে যিনি বিজ্ঞ এবং ফাছেকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ তানযিহী। জুমা, ঈদ ও কুছুফের নামাযে যোগ্য পরহেজগার ইমাম হওয়া প্রয়োজন।

যারা নিজ খান্দানের ইমাম নিযুক্ত করার জন্য হাদীসের বাহানা তালাশ করে, তারা তো প্রকৃত খান্দানী নয়-কেননা, তারা নেককার ও বদকারকে এক মনে করে। এতে খান্দানী বৈশিষ্ট কোথায় রইলো? বুঝা গেলো-মাসআলার চেয়ে তাদের খান্দানের প্রাধান্য বেশী। তারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রবৃত্তি পূজারী। এরকম হতে দেওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ্ তায়ালা শরিয়তের পাবন্দী করা ও উলামাগনের আনুগত্য করার তৌফিক দিন।

ছাওয়াল-৪৮ ঃ মাদ্রাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি মাদ্রাসার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া বা কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা অথবা সম্পূর্ন বিক্রি করে অন্যত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, অথবা মাদ্রাসার পরিচালনার জন্য বিক্রিত টাকা খরচ করা- দুরস্ত আছে কিনা?

জওয়াব ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বা জমি শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিত বিক্রি করে উহার পরিবর্তন করা হারাম। এক মাদ্রাসার আমদানী অন্য মাদ্রাসার জন্য খরচ করা হারাম। বিশেষ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিত উহা লীজ দেওয়া অথবা কৃষি কাজে ব্যবহার করা হারাম। তবে মজবুরি অবস্থায় মাদ্রাসার কিছু অংশ সাময়িক লীজ দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন পূরন হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। (দুররে মুখতার, ফতহুল ক্বাদীর-প্রভৃতি)।

ছাওয়াল-৪৯ ঃ মৃত্যু শয্যায় কোন বিশেষ ওয়ারিশানের নামে হেবা বা অসিয়ত করা দুরস্ত হবে কিনা?

জওয়াব ঃ মৃত্যু শয্যায় কেউ যদি কোন বিশেষ ওয়ারিশের নামে হেবা বা অসিয়ত করতে চায়- তাহলে অন্য ওয়ারিশগনের অনুমতি ব্যতিত ইহা কার্যকর হবে না। তানভীরুল আবছার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- صَحَّتْ لَا لِوَارِثِهِ اِلَّا بِاِجَازَةِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ۔

অর্থাৎ "মৃত্যু শয্যায় অন্যের নামে হেবা বা অসিয়ত করলে তা কার্যকর ও সহীহ হবে- কিন্তু তার ওয়ারিশানদের মধ্যে কারো নামে করতে চাইলে তাদের বয়স্ক সকলের অনুমতিক্রমে তা কার্যকর হবে- নতুবা নয়"।

ছাওয়াল-৫০ ঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়ে কত বৎসরে বালেগ হতে পারে?

জওয়াব ঃ ছেলেদের বেলায় অন্যুন ১২ বৎসর এবং মেয়েদের বেলায় অন্যুন ৯ বৎসরে বালেগ হতে পারে। এর কমে কস্মিনকালেও বালেগ-বালেগা বলে শরীয়তে স্বীকৃত হবে না। সাবালেগ হওয়ার উর্দ্ধ বয়স হলো উভয়ের ক্ষেত্রে ১৫ বৎসর- যদিও বালেগ হওয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া না যায়।

বালেগ হওয়ার আলামত হলো- ছেলেদের বেলায় বীর্য বের হওয়া।

মেয়েদের বেলায় হায়েয হওয়া। ৯ বা ১২ বৎসর হতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এসব আলামত প্রকাশ পেলেই তখন থেকে বালেগ বা বালেগা বলে গন্য হবে। ১৫ বৎসর হয়ে গেলে এমনিতেই বালেগ বালেগা বলে গন্য হয়ে যাবে। আলামতের প্রয়োজন নেই।

ছেলেদের বেলায় আর একটি আলামত হলো-মিলনের মাধ্যমে যদি কোন বালিকা বা মহিলাকে বৈধ বা অবৈধভাবে গর্ভবতী করে দেয় এবং মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে উক্ত ছেলে মেয়েকে সাবালেগ বলে ধরে নিতে হবে। আর যদি ৯/১২-১৫ বৎসরের মধ্যে কোন আলামত পাওয়া না যায় কিন্তু তারা বলে-আমরা সাবালেগ বা সাবালেগা হয়েছি এমতাবস্থায় যদি বাহ্যিকভাবে তাদের দাবি মিথ্যা বলে মনে না হয়-তাহলেও সাবলেগ ধরে নিতে হবে এবং শরিয়তের বিধি বিধান তাদের উপর জারী হবে। আর যদি বাহ্যিক অবস্থায় সেরকম ধারণা না হয়-তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা যাবেনা- নাবালেগ বলেই ধরে নিতে হবে।

উপরে বর্ণিত আলামত ছাড়া যদি বগলে বা পায়ের গোড়ালীতে বা লজ্জাস্থানে পশম উঠে অথবা ছেলের দাঁড়ি মোচ উঠে এবং মেয়ের স্তন উচুঁ দেখায়, তাহলে এগুলো শরিয়ত মোতাবেক সাবালকত্বের মূল প্রমাণ নয়। দোররে মোখতারে উল্লেখ আছে-

بُلُوْغُ الْغُلَامِ بِالْاِحْتِلَامِ وَالْاِحْبَالِ وَالْاِنْزَالِ وَالْجَارِيَةِ بِالْاِحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ۔ فَاِنْ لَّمْ يُوْجَدْ فِيْهَا حَتّٰى يَتِمَّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا خَمْسُ عَشْرَةَ سَنَةً۔ بِهٖ يُفْتٰى ۔ وَاَدْنٰى مُدَّتِهٖ لَهٗ اِثْنَا عَشَرَ سَنَةً وَلَهَا تِسْعُ سِنِيْنَ هُوَالْمُخْتَارُ ۔ فَاِنْ رَاهَقَا وَقَالَا بَلَغْنَا صُدِّقَا اِنْ لَّمْ يُكَذِّبْهُمَا الظَّاهِرُ۔

অর্থাৎ-"ছেলেদের বেলায় বালেগীর চিহ্ন হলো-স্বপ্নদোষ হওয়া, গর্ভবতীকরার ক্ষমতা অর্জন করা এবং বীর্য স্থলন হওয়া। আর মেয়েদের বেলায় চিহ্ন হলো-স্বপ্নদোষ, হায়েয ও গর্ভবতী হওয়া। যদি এসব আলামত তাদের মধ্যে পাওয়া না যায়-তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রেই ১৫ বৎসর পূর্ণ হলে সাবালেগ ও সাবালেগা বলে গন্য হবে। এই মতের উপরই ফতোয়া প্রদান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে হবে। আর ছেলেদের বেলায় নুন্যতম মুদ্দত হলো ১২ বৎসর এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ৯ বৎসর। ইহাই ফতোয়া হিসাবে স্বীকৃত মত। আর যদি তারা সাবালেগ হওয়ার কাছাকাছি হয় আর তারা দাবী করে যে, আমরা এখন সাবালেগ ও সাবালেগা হয়েছি- তা হলে যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে সাবালেগ বলে মনে হয় তাহলে তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য"।

(প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রমান করার জন্য শরিয়তের মাপকাঠিই গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে আদালতে ১৮ বৎসরের আইনটি পরিবর্তন হওয়া উচিত। আদালতে নিম্নতম বয়স ধরা হয়েছে ১৮ বৎসর। ইহা শরিয়তি বিধান নয়- বরং সাংঘর্ষিক। সাজা প্রাপ্তি, বিবাহ বন্ধন সহ অনেক কিছুই নির্ভর করে শরিয়তের মাসআলার উপর-অনুবাদক)

ছাওয়াল-৫১ ঃ শহরে বৃষ্টির পানি নালাসমূহ পরিষ্কার করে গড়িয়ে বাইরে চলে যায়। উক্ত পানি পাক না-নাপাক? এই পানিকে প্রবাহিত পানি বলা যাবে কিনা? অথবা সেটাকে নাপাক পানি বলা হবে কিনা?

জওয়াব ঃ যখন বৃষ্টি হয় এবং পানি গড়িয়ে যায়-তখন উহাকে প্রবাহিত ও পাক পানিই বলা যাবে। (যদি ময়লার সাথে না মিশে)। হ্যাঁ,যদি নাপাকীর কিছু পাওয়া যায় অথবা পানির রং ও স্বাদ পরিবর্তিত হয়-তাহলে অবশ্য নাপাক বলেই গন্য হবে।

বাকী রইলো অযু করা যাবে কিনা। যদি ঐ পানির সাথে নাপাক কোন বস্তু দৃশ্যমান হয়-তাহলে নিঃসন্দেহে নাপাক বলে গন্য হবে। পাত্রে বা ভান্ডের মধ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করলে যদি তাতে সামান্য নাপাক বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়-তাহলে অবশ্যই বদ্ধ ও নাপাক পানি বলে বিবেচিত হবে।

এতক্ষন বলা হলো আইনের কথা। নালার পানি সাধারনতঃ নাপাকই হয়ে থাকে। তাই অযু গোসলে ব্যবহার না করাই উত্তম। আর বৃষ্টির পানি এক জায়গায় জমে গেলে যদি নাপাক বস্তু দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে উহাও নাপাক। আর যদি নালা সম্পূর্ণ পরিস্কার ও নিঃসন্দেহ হয়-তাহলে ঐ প্রবাহিত বৃষ্টির পানি দ্বারা অযু গোসল করা জায়েয-যদিও তা উত্তম নয়।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মদ, ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ সমাপ্ত- ডিসেম্বর'০৫)

পরিশিষ্ট

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) পরিচিতিঃ জীবন ও কর্ম

জন্ম ঃ ১০ই শাবান ১২৭২ হিজরী/ ১৮৫৬ ইং।

ইনতিকাল ঃ ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী/ ১৯২১ ইং রোজ শুক্রবার।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আ'লা হযরত-ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এমন এক যুগ- সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন-যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় ইসলামের বাতিল ফের্কাগুলো আরবে ও আজমে-সর্বত্র ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আকিদা সমূহের উপর কঠোর আঘাতহানা শুরু করেছিল। আরবের অভিশপ্ত নজদ প্রদেশের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ভারতীয় অনুসারীরা বালাকোট আন্দালন তথা ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের ঈমান আক্বিদা বিনষ্ট করছিল। পাক ভারত উপমহাদেশেও নজদের ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ এসে ঈমানের উপর একের পর এক আঘাত হানছিল। ইংরেজদের সহায়তায় ১৮৬৭ সালে তারা বিরাট ধরণের দেওবন্দ ওহাবী মাদ্রাসা তৈরী করে ওহাবী মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাকভিয়াতুল ঈমান, সিরাতে মোস্তাক্বিম, তাহযিরুন্নাছ, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারাহীনে কাতেয়া, হিফযুল ঈমান ও বেহেস্তী জেওর- প্রভৃতি ঈমান বিধ্বংসী ওহাবী মতবাদী কিতাব সমূহ বিদেশী অর্থানুকুল্যে ছেপে ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মান মর্যাদার উপর এসব কিতাব দ্বারা জঘন্য আক্রমণ পরিচালনা করা হচ্ছিল। উদাহরণ স্বরূপঃ এসব কিতাবে লিখা আছে-"আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে সক্ষম (ইমকানে কিজব), আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের নবীজীর মত হাজারো মোহাম্মদ সৃষ্টি করতে পারেন, নবীজীর মর্যাদা আল্লাহ্‌র তুলনায় চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট, নবীজীর এলেমের চাইতে শয়তানের এলেম বেশী ব্যাপক, নবীজী মরে পঁচে গলে মাটি হয়ে গেছেন, নবীজীর মর্যাদা বড় ভাইয়ের তুল্য, খাতামুন্নাবিয়ীন অর্থ শেষ নবী নয়, নবীজীর গায়েবী এলেমের মত এমন এলেম চতুষ্পদ জন্তুরও আছে, মিলাদ ও কেয়াম কৃষ্ণলীলার গান, নামাযে নবীজীর খেয়ালের চেয়ে গরু-গাধা ও যিনার খেয়াল অধিক ভাল-ইত্যাদি বেদ্বীনি আক্বিদা সমূহ। উপরে উল্লেখিত কিতাব সমূহে এসব জঘণ্য উক্তি লিখে প্রচার করা হচ্ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনি এক ঘনঘোর অমানিশা যখন উপমহাদেশের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে সময়ে আল্লাহর রহমত স্বরূপ ভারতের বাঁশ বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)। ১২৭২ হিজরী ১০ই শওয়াল মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইসায়ী সালে ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) বেরেলীর এক খান্দানী ও ঐতিহ্যবাহী পাঠান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ১ বৎসর পূর্বেই তাঁর জন্ম। সুতরাং পরবর্তী আযাদী আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষাঃ মাত্র তের বৎসর দশ মাস চার দিনে তিনি হিফযুল কোরআন, হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য সহ সমস্ত আক্‌লী ও নক্‌লী এলেম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ঐদিনেই তিনি আপন পিতা আল্লামা নকী আলী খান (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ফতোয়া লিখে মুফতী পদে সমাসীন হন। মজার ব্যাপার-ঐদিনেই তাঁর উপর নামায ফরয হয় অর্থাৎ তিনি বালেগ হন।

এই পদে একাধারে ৫৪ বৎসর দায়িত্ব পালন করে ১৩৪০ হিজরীতে ৬৮ বৎসর বয়সে ২৫শে সফর শুক্রবার তিনি ইনতিকাল করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদ ও নিজ প্রতিভার মাধ্যমে ৫৫ প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের শাখায় ভুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞানের এতগুলো শাখায় বিচরণ করা একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন যুগের দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা সদৃশ। আল্লামা ইকবাল (রহঃ) তাঁকে এই উপাধীতেই স্মরণ করতেন। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি যেসব ফতোয়া প্রদান করেছেন-সেগুলোর সম্মিলিত নাম রাখা হয়েছে ফতোয়ায়ে রিজভীয়-যা ১২ খণ্ডে ১২ হাজার পৃষ্ঠায় বিরাট ভলিউমে ছাপা হয়েছে। এর বর্তমান হাদীয়া ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার টাকা)। এই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সময়ে আ'লা হযরত জ্ঞানের ৫৫টি শাখায় প্রায় ১৫০০ কিতাব রচনা করেছেন। আ'লা হযরতের জীবনী গবেষক ডঃ মাসউদ আহমদ বলেন- "শুধু হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা টীকা গ্রন্থের সংখ্যাই ৪৬টি। কানযুল ঈমান নামে পবিত্র কালাম মজিদের যে উর্দু অনুবাদ তিনি রচনা করেছেন-তা অতুলনীয় ও সম্পূর্ণ নির্ভুল। এমনকি- গতিশীল বিজ্ঞানও আ'লা হযরতের অনুবাদের ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। তিনি সরাসরি প্রামান্য তফসীর থেকে তাঁর অনুবাদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন-যা অন্যান্য অনুবাদে প্রায়শঃই অনুপস্থিত। তাই তিনি অনুবাদের নাম রেখেছেন "কানযুল ইমান" বা ঈমানের খনি। কোরআন মজিদের আক্বায়েদ সংক্রান্ত আয়াত সমূহের সঠিক অনুবাদ একমাত্র কানযুল ঈমানেই পাওয়া যায়। অন্যত্র তা খুবই বিরল। এজন্যই

সৌদী সরকার কানযুল ঈমানের বড় শত্রু। কেননা, এতে তাদের কৃত অনুবাদ ও আক্বায়েদের অসারতা ধরা পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। কানযুল ঈমানের বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের অবদান

জ্ঞান তাপস আ'লা হযরত (রহঃ) বিভিন্ন ওস্তাদ বা আপন প্রকৃতিগত প্রতিভার মাধ্যমে যেসব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন-তার সংখ্যা ৫৫টি। তিনি নিজেই এসব বিদ্যার একটি তালিকা তৈরী করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা শরীফের মুফতী খলিল মককী (রহঃ)-এর কাছে পেশ করেছিলেন এবং এগুলোর এযাযত বা অনুমতি সনদও লাভ করেছিলেন। যারা "হাকিমূল উম্মত"-বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং ৯০০টি কিতাবের রচয়িতা বলে তাকে সমাজে বিরাটভাবে তুলে ধরতে চায়-তাদের জানার জন্যই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর জ্ঞান শাখার সংখ্যা ও তার প্রণীত গ্রন্থের কিছু পরিচয় তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করছি।

আ'লা হযরতের অর্জিত বিদ্যার সংখ্যা ও তালিকা

(১) ইলমূল কোরআন
(২) ইলমূল হাদীস
(৩) ইলমে তাফসীর
(৪) ইলমে উসুলে হাদীস
(৫) ইলমে আসমাউর রিজাল (হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী)
(৬) ইলমে ফিক্‌হ
(৭) ইলমে উসুলে ফিক্‌হ
(৮) ইলমে আকাঈদ ওয়াল কালাম (দর্শন)
(৯) ইলমে ফারায়েয
(১০) ইলমে নাহু
(১১) ইলমে সরফ
(১২) ইলমে মা'আনী
(১৩) ইলমে বয়ান
(১৪) ইলমে বদী'
(১৫) ইলমে আরুজ
(১৬) ইলমে মোনাযারা
(১৭) ইলমে মানতিক
(১৮) ইলমূল আদব (সর্ব বিষয়ের সাহিত্য)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৯) ইলমে ফিক্‌হে হানাফী
(২০) ইলমে জদল মহাযযব
(২১) ইলমে ফালছাফা
(২২) ইলমে হিসাব (গণিত)
(২৩) ইলমে হাইয়াত (জ্যোতির্বিদ্যা)
(২৪) ইলমে হান্দাসা (জ্যামিতি)
(২৫) ইলমে ক্বেরাত
(২৬) ইলমে তাজবিদ
(২৭) ইলমে তাসাউফ (সুফীতত্ত্ব)
(২৮) ইলমে সুলুক (তরিকত জগতে ভ্রমণ)
(২৯) ইলমে আখলাক
(৩০) ইলমে সিয়ার
(৩১) ইলমে তারিখ (ইতিহাস)
(৩২) ইলমূল লুগাত (অভিধান)
(৩৩) এ্যারিস মাতী ক্বী
(৩৪) যবর ও মোকাবালাহ্
(৩৫) হিসাবে সিত্তানী
(৩৬) লগারিথম (Logaritham)
(৩৭) ইলমে তাওকীত (সময় নির্দ্ধারণ বিদ্যা)
(৩৮) মুনাযারা ও মারায়াহ
(৩৯) ইলমুল আকর
(৪০) যীজাত
(৪১) মুছাল্লাছে কুরভী
(৪২) মুছাল্লাছে মোসাত্তারাহ
(৪৩) হাইয়াতে জাদিদা
(৪৪) মুরাববাআত
(৪৫) ইলমে জফর
(৪৬) ইলমে যায়েরজাহ্
(৪৭) আরবী পদ্য
(৪৮) ফার্সী পদ্য
(৪৯) হিন্দী পদ্য
(৫০) আরবী গদ্য
(৫১) ফার্সী গদ্য
(৫২) হিন্দী গদ্য
(৫৩) কেতাবাত বা বিশেষ লিখন পদ্ধতি
(৫৪) খত্তে নাসতালীক পদ্ধতির লিখন (ক্যালিগ্রাফী)
(৫৫) তাজবীদসহ ক্বেরাত

আ'লা হযরতের মূল্যায়ণ

উপরোক্ত ৫৫টি বিদ্যায় আ'লা হযরতের পান্ডিত্যের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ ইসায়ী সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ যিয়াউদ্দীন সাহেব রামপুর (ইউপি) হতে প্রকাশিত 'দবদবা-ই-সিকান্দরী' নামক পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রচার করেন। আ'লা হযরত সাথে সাথে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়ে অন্য একটি চতুর্ভূজ সংক্রান্ত প্রশ্ন তার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। স্যার যিয়াউদ্দীন এতে হতবাক হয়ে যান-একজন আরবী জানা আলেম কি করে এই বিদ্যা অর্জন করলেন? এই ঘটনায় স্যার যিয়াউদ্দীন আ'লা হযরতের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েন।

আর একটি ঘটনা। গণিত সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য স্যার যিয়াউদ্দীন বড় পেরেশান হয়ে পড়েন। অতঃপর প্রফেসার সুলাইমান আশরাফের অনুরোধে তিনি বেরেলী শরীফ আগমন করে অংকটি আ'লা হযরতের দরবারে পেশ করেন। আ'লা হযরত নিমিষের মধ্যে উক্ত অংকের সমাধান পেশ করে দেন। এতে স্যার যিয়াউদ্দীন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন-"মনে হয় আ'লা হযরত এই বিষয়ে পূর্বেই গবেষণা করে সমাধান তৈরী করে রেখেছিলেন। বর্তমানে ভারত বর্ষে এটা জানার মত লোক নেই"। (হায়াতে আ'লা হযরত)।

আ'লা হযরতের "হাদায়েকে বখশীষ" নামক কাব্যগ্রন্থ ও ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেন-"ইনি যুগের ইমাম আবু হানিফা" (হায়াতে ইমামে আহলে সুন্নাত ডঃ মাসউদ আহমদ)।

জামাতে ইসলামীর তৎকালীন নায়েবে আমীর আল্লামা কাউছার নিয়াজী বলেন, "আমি মনে করেছিলাম-ইসলামের কোন এলম সম্পর্কে জানা আমার বাকী নেই। কিন্তু আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে মনে হলো-আমি ইসলামী জ্ঞান সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি"। (আ'লা হযরত কনফারেন্স করাচী-কাউছার নিয়াজীর পঠিত প্রবন্ধ)।

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মোহাদ্দেহ ইদ্রিস কান্দালভী আ'লা হযরতের বিখ্যাত নাতিয়া কালাম-"মোস্তফা জানে রহমত পে

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাখে ছালাম" আদ্যোপান্ত পাঠ করে ভাবাবেগে বলে উঠেন-"হাশরের দিনে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাঁর অতুলনীয় এই একটি অনুপম কসিদার কারণেই নাজাত পেয়ে যেতে পারেন" (আ'লা হযরত কনফারেন্স, করাচী-কাউছার নিয়াজীর জবানী)।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর কতিপয় গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) দেড় হাজার কিতাব রচনা করে অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এক একটি কিতাবের পরিধিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ও কানযুল ঈমান গ্রন্থদ্বয়ই তার প্রমাণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের রচিত কিতাব সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বহুল পরিচিত ও আলোচিত।

ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ঃ

১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়ার সমষ্টি। ১২ ভলিউমে সমাপ্ত। হাদিয়া ১৮,০০০/- টাকা। ফিকহী মাছায়েলের এমন কোন শাখা নেই-যা ফতোয়ায়ে রিজভীয়াতে বর্ণিত হয়নি। এক একটি মাসআলার উত্তরে তিনি নির্ভরযোগ্য ফিকহের অসংখ্য দলীল ও রেফারেন্স উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত মসআলার উত্তর দিয়েছেন। যে কোন দক্ষ আলেম ও মুফতী ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পাঠ করলে দলীলের সমাহার দেখে তাকে স্তম্বিত হয়ে যেতে হবে। অতি সূক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ সহকারে তিনি প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়েছেন। ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ও বেহেস্তী জেওর নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা গৌরব করে-অথচ এগুলোতে শুধু সংক্ষেপেই বিকৃত উত্তর দেয়া হয়েছে। দলীল খুব কমই দেখা যায়। চোখ বুঝে ভক্তরা বিশ্বাস করে নেন। কিন্তু আ'লা হযরতের প্রত্যেকটি ফতোয়ায় অসংখ্য দলীল আদিল্লা দ্বারা মসআলাটি পরিষ্কার ও বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। এখানেই আ'লা হযরতের নিরপেক্ষতার প্রমাণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কানযুল ঈমান ঃ

কোরআন মজিদের প্রামানিক ও তাফসীর ভিত্তিক উর্দ্দু অনুবাদ।

আ'লা হযরত বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহের একটি পৃথক তালিকাও উক্ত অনুবাদে সংযুক্ত করেছেন- যাতে যে কোন বিষয়ে জ্ঞানী ও গবেষক ব্যক্তি অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারেন। বর্তমানে কানযুল ঈমান ও পার্শ্ব টীকা খাযায়েনুল ইরফানের বাংলা অনুবাদ করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান চট্টগ্রামী। অন্যান্য ১২ জন লেখকের ১২টি অনুবাদের সাথে কানযুল ঈমানের অনুবাদ তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে, আ'লা হযরতের অনুবাদটিই সর্বোত্তম এবং ইসলামী আক্বিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (ইমাম আহমদ রেজা আওর উর্দু তারাজিমে কোরআনকা তাকাবুলী জায়েযাহ)।

আদ-দৌলাতুল মক্কিয়া বিল মা'দ্দাতিল গায়বিয়া ঃ

এই গ্রন্থটি মক্কার জেলখানায় বসে আরবীতে রচিত। ভারতীয় দেওবন্দী ওহাবীদের চক্রান্তে আরবের মক্কা শরীফের জেলখানায় বসে মাত্র আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে আ'লা হযরত (রহঃ) উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। মক্কার গভর্ণর (শরীফ)-এর নির্দেশে আ'লা হযরত (রহঃ) নবী করিম (দঃ)-এর অদৃশ্য বিষয়ক এলম বা ইলমে গায়েব-এর উপর দেড়শত পৃষ্ঠার উক্ত কিতাবখানা লিখে ফেলেন। গভর্ণর পান্ডুলিপি দেখে হুযুর (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের দলীলাদি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। আ'লা হযরত এই কিতাব রচনায় কোন রেফারেন্স গ্রন্থ দেখার সুযোগই পাননি। শরীফ তার কুতুবখানায় সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন-উক্ত গ্রন্থের হুবহু দলীল ও উদ্ধৃতি সমূহ আদ-দৌলতুল মক্কিয়ায় বিদ্যমান। এতে তিনি বুঝতে পারলেন- আ'লা হযরতেরও কাশফ আছে। উক্ত মূল্যবান গ্রন্থখানাও বাংলায় অনুদিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের পান্ডুলিপি দেখে হারামাঈন শরীফাইনের বহু আলেম ও মুফতীগণ আ'লা হযরতের হাতে বয়আত হয়ে যান এবং তাঁকে চতুর্দশ (১৪০০) শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

হুসসামূল হারামাঈন ঃ

আ'লা হযরত এই গ্রন্থখানা "আল মো'তামাদ ওয়াল মোস্তানাদ" নামে আরবীতে রচনা করেন। এতে হিন্দুস্থানের ৫জন আকাবিরীনে দেওবন্দ ওলামার কিতাব সমূহের বিভিন্ন উর্দু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নীচে এগুলোর আরবী আনুবাদ করে ১৩২৩ হিজরীতে মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মোনাওয়ারার ৩৩জন মুফতীর খেদমতে পেশ করে তাদের মতামত চান। উক্ত ৫ জন দেওবন্দী ওলামাদের গ্রন্থসমূহের মন্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে সক্ষম, (তাকভীয়াতুল ঈমান ও ফতোয়ায়ে রশিদিয়া)

(২) নবী করিম (দঃ) মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছেন,(তাকভিয়াতুল ঈমান)।

(৩) নবীজীর এলেমের চেয়ে শয়তানের এলেম বেশী ব্যাপক, (বারাহীনে কাতেয়া)।

(৪) নবীজীর ইলমে গায়েবের মত এমন ইলমে গায়েব চতুস্পদ জন্তুরও আছে, (থানবীর হিফযুল ঈমান)।

(৫) মূর্খরা বলে থাকে-খাতাবুন্নাবিয়ীন অর্থ-শেষ নবী, কিন্তু খাতাবুন্নাবীয়ীন-এর প্রকৃত অর্থ-শেষনবী নয়-বরং মূল নবী। তার পরে এক হাজার নবীর আগমন মেনে নিলেও "খাতাবুন্নবীয়ীন বা মূল নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাত্যয় হবে না" (তাহ্যীরুন্নাছ)

হারামাঈন শরিফাঈনের ৩৩জন মুফতী উক্ত এবারত সমূহ পর্যালোচনা করে ঐগুলোর লেখকগণকে সরাসরি কাফের ঘোষনা করেন। তাদের উক্ত ফতোয়ার নাম হয় "হুসসামূল হারামাঈন" বা মক্কা-মদিনার "তীক্ষ্ণ তলোয়ার"। এটা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরতের অবিস্মরনীয় অমর কীর্তি। হুসসামূল হারামাঈন-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন হাফেজ মাওলানা আবদুল করিম নঈমী (মূলফতগঞ্জ) এবং সম্পাদনা করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা আব্দুল মান্নান। সুন্দর ভাবে সম্পাদনা করতে পারলে কিতাবটি আরও সুখপাঠ্য হতো।

আল-কাওকাবাতুশ শিহাবীয়া ফী রদ্দে আবিল ওয়াহাবিয়া ঃ

ইসমাঈল দেহলভীর রচিত ৭০টি কুফরী ও বাতিল আক্বিদা সম্পন্ন কিতাব "তাকভীয়াতুল ঈমান" ও ইযাহ্-এর খন্ডনে লেখা হয়েছে উক্ত গ্রন্থ। সংক্ষেপে ওহাবী কুফরী আক্বিদা সমূহ জানতে হলে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাতিল আক্বিদার বিরুদ্ধে আ'লা হযরত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

পাকিস্তানে ৩টি ওহাবী কিতাব নিষিদ্ধ ঘোষণা ঃ আ'লা হযরতের আন্দোলনের ফল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাকভীয়াতুল ঈমান, সীরাতে মুস্তাকীম, ফতোয়া রশিদিয়া- প্রভৃতি দেওবন্দী কিতাবের বিরুদ্ধে যে কলমযুদ্ধ শুরু করে গেছেন- তাঁর ফলাফল আমরা পেয়েছি ১০৪ বৎসর পর বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর ০৬ইং। এই তারিখে পাকিস্তান সরকার এই ৩টি কিতাব নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন। (সুত্রঃ ডন করাচী ২১শে সেপ্টেম্বর' ০৬ এবং ওয়েব সাইট ntt pi ll w.w.w. ente media ucla edu 1.

আ'লা হযরতের গ্রন্থসমূহ পর্যালোচা করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। ফতোয়ায়ে আফ্রিকা, ইরফানে শরিয়ত আহকামে শরীয়ত, হেদায়াতুল গবী ফি: ইসলামে আবাওয়াইন নবী, মাদারেজে তাবাকাতুল হাদীস, হাদায়েকে বখশিস-ইত্যাদি গ্রন্থগুলো খুবই মশহুর ও পৃথিবীময় প্রচলিত। অধীন লেখক "ইরফানে শরীয়তের বঙ্গানুবাদ লিখেছি।

আ'লা হযরত (রহঃ) চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও সুন্নী আক্বিদার একমাত্র ইমাম ঃ আমরা তাঁর আক্বিদার অনুসারী মাত্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ১২৮৬ হিজরী সাল হতে তার তাজদিদী কার্যক্রম শুরু করেন এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য তাঁর এলেমের প্রাধান্য বিস্তার, এক শতাব্দীর শেষ ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংস্কার কার্যক্রম প্রকাশ এবং এর প্রতি জনগণের স্বীকৃতি প্রধান শর্ত। আ'লা হযরতের মধ্যে এই সব শর্তই বিদ্যমান ছিল বলে সে যুগের আরব ও আজমের মশহুর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখীনে ইযাম তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রভৃতি প্রদান করেছেন। বরিশাল জেলার নেছারাবাদের মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব) তার মুজাদ্দিদ গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেছেন এবং ১৩ জন মুজাদ্দিদের তালিকাও উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। মক্কা মদিনাসহ সুন্নী জগতের ওলামাগণ বিনা ইখতিলাফে আ'লা হযরতকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরতের সংস্কার কার্য্যক্রমের প্রধান দিক ছিল আক্বায়েদ সংশোধন করা। ওহাবী, খারেজী, নজদী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় আরব আজমসহ সর্বত্র বাতিল আক্বিদা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছিল। তৎকালে তারা ইংরেজদের সহায়তায় নিত্য নূতন বাতিল আক্বিদার কিতাব রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মুসলমান সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে সনাতন মূল ইসলামী আক্বিদায় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমান- অন্যদিকে নব্যসৃষ্ট ওহাবী, খারেজী, কাদিয়ানী, বাহায়ী ফের্কার নতুন সম্প্রদায়সমূহ আক্বিদাগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা কাদিয়ানী, ওহাবী ও হিন্দুদের সহায়তায় আরবে ও ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে।

ওহাবীরা কিতাবুত তাওহীদ, তাকভীয়াতুল ঈমান, তাহযিরুন্নাছ, সিরাতে মোস্তাকিম, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারাহীনে কাতেয়া, বেহেস্তী জেওর, হেফযুল ঈমান, ইসলাহে রুছুম-প্রভৃতি বাতিল আক্বিদা সম্পন্ন কিতাব লিখে মুসলমানী অনেক আক্বিদা ও ক্রিয়াকর্মকে শিরক ও বিদআত বলে প্রচার করতে থাকে।

তারা ঘোষণা করেঃ "যারা রাছুলকে হায়াতুন্নবী মানবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ-বলে সম্বোধন করবে,মিলাদ কিয়াম করবে, রাসুলের শাফাআত মানবে, রাসুলের ইলমে গায়ব মানবে, রাসুলকে হাযির নাযির বলে বিশ্বাস করবে, নামাযে রাসুলকে ছালাম করার সময় রাসুলের খেয়াল করবে-যারা "খাতুবুন্নবীয়ীন" শব্দের অর্থ করবে শেষ নবী বলে, যারা আযানের দোয়ায় হাত তুলবে, যারা নবী বখ্শ, গোলাম কাদের, গোলাম জিলানী ও গোলাম আলী- ইত্যাদি নাম রাখবে-তারা গোমরাহ, বেদয়াতী ও মুশরিক"।

এভাবে ওহাবীরা ভারতের সর্বত্র শিরক বিদআতের বাজার বসিয়ে সুন্নী মুসলমানদেরকে মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে বিভেদ ও সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সুত্রপাত হয়। এই সুযোগে ইংরেজরা হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদেরকে ন্যাস্ত নাবুদ করে ছাড়ে। উপরে উল্লেখিত ওহাবী কিতাবসমূহে শিরক-বিদআতের উপরোক্ত ঘোষণাগুলো লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনো কউমী-খারেজী মাদ্রাসায় এগুলোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

ভারতীয় মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে যিনি কলম তরবারীর মাধ্যমে বাতিল পন্থীদের উক্ত বে-দ্বীনি লেখনীর মোকাবেলা করে এগুলোকে কচুকাটা করেন, সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে রক্ষা করেন এবং শিরক ও বিদআত ফতোয়াবাজীর দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করে ইসলামী আক্বায়েদকে স্বস্থানে পূণঃ প্রতিষ্ঠিত করেন-তিনিই হচ্ছেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)।

তাঁর আক্বায়েদ গ্রন্থগুলো পাঠ করেই আজ আমরা নতুন উদ্যমে বাতিলের মোকাবেলায় সামনে এগিয়ে চলেছি। এদেশে তৈরী হচ্ছে সুন্নী আদর্শের নূতন কাফেলাও আ'লা হযরতের আদর্শের সৈনিক। সুতরাং আ'লা হযরত (রহঃ) আমাদের ইমান ও আক্বায়েদ রক্ষাকারী, বাতিল আক্বিদা হতে মুক্তিদাতা।

তিনি জীবদ্দশায়ই তাঁর আদর্শ সৈনিক তৈরী করে গিয়েছেন। সদরুল আফাযেল মাওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, হামেদ রেযা খান, মুফতীয়ে আযম হিন্দ হযরত মোস্তফা রেযা খান, সদরুস শরীয়াহ্ হযরত মাওলানা আমজাদ আলী, মালিকুল ওলামা হযরত মাওলানা যফরুদ্দীন বিহারী, মোহাদ্দিসে আযম সরদার আহমদ লায়লপুরী, আল্লামা হাশমত আলী লাখ্নু- প্রমুখ শাগরিদ মনিষীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের ওহাবীশিকারী বাজপাখী এবং কলম সম্রাট। সদরুল আফাযেলের আত্ইয়াবুল বয়ান, তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান, মাওলানা আমজাদ আলীর বাহারে শরীয়ত, মাওলানা হাশমত আলীর ইসলাহে বেহেস্তী জেওর-প্রভুতি গ্রন্থ ওহাবী কিল্লায় এক একটি এটম বোম স্বরূপ।

আধ্যাত্মিক জীবন

আ'লা হযরত (রহঃ) আধ্যাত্মিক জগতের এক কামেল মহাপুরুষ ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত। জব্বলপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাঁর মুরীদের সংখ্যা সর্বাধিক।

অর্ধশতাব্দী কাল কলমযুদ্ধ চালিয়ে বাতিলের কিল্লায় মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়তের মশাল জ্বালিয়ে আ'লা হযরত ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমদ রেযা খান (রহঃ) ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী রোজ শুক্রবার মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরপারে মাওলায়ে হাকিকী এবং মাহবুবে এলাহী- উভয় প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমণ করেন। প্রতি বৎসর বেরেলী শরীফে তাঁর ওফাত দিবসে অগণিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে ৩ দিন ব্যাপী উরছে আ'লা হযরত পালিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা আ'লা হযরত (রহঃ) কে জান্নাতুল ফেরদৌসে বুলন্দ দরজা নসীব করুন।

শিশুকালে আ'লা হযরতের জ্ঞানের বিকাশ

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) মক্তবে ওস্তাদের নিকট আরবী বর্ণমালা শিক্ষাকালে ওস্তাদ যখন "লাম-আলিফ" বললেন-তখন শিশু আ'লা হযরত জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওস্তাদজী! একবার তো লাম ও আলিফ পৃথকভাবে পড়েছি-আরেক বার যুক্তভাবে পড়বো কেন? ওস্তাদ ও উপস্থিত সকল ওলামাগণ আ'লা হযরতের জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনে অভিভুত হয়ে যান। অবশ্য তাঁর পিতা নকী আলী খান (রহঃ) বললেনঃ আরবী হরফের দ্বারা "আলিফ" (اَلِفْ) লিখতে মধ্যখানে "লামে"র দরকার হয় এবং 'লাম' (لَامْ) লিখতেও মধ্যখানে "আলিফে"র প্রয়োজন হয়। আলিফ ও লামের মধ্যে এই সখ্যতা ও নির্ভরতার কারণেই পুনরায় একত্রে লাম-আলিফ যুক্তাক্ষরে দেখানো হয়েছে। ﻻ- এখানে প্রথমটি লাম এবং দ্বিতীয়টি আলিফ।

বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত (রহঃ)-এর মূল্যায়ন

আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রহঃ) ছিলেন একজন খাঁটি নবীপ্রেমিক ও ইসলামী জ্ঞান বিশারদ। তাঁর জন্ম এমন এক সময় হয়েছিল- যখন বিজাতি বৃটিশরা উপমহাদেশে তাদের সাম্রাজ্য পূর্ণ বিস্তার করেছিল এবং দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছিল। বৃটিশরা ধর্মীয় অংগনে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য কিছু ভারতীয় দেওবন্দী উলামাকে ভাড়া করে তাদের দিয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়ে কুরআন সুন্নাহ্‌র অপব্যাখ্যা দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের ইমান আক্বিদা কলুষিত করছিল। বিশেষ করে ইসলামের মহানতম পয়গম্বর হযরত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মর্যাদা খাটো করে এই সব ভাড়াটে মওলভীরা যখন ফতোয়াবাজি করছিল- ঠিক তখনই বজ্র নিনাদে আ'লা হযরত শাহ আহ্‌মদ রেযা খাঁন সাহেব (রহঃ) ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে কলমী যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং মুসলমানরূপী নবীর শত্রুকে সমূলে উৎখাত করেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের হৃদয়ে রাসুলপ্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ঈমানকে সঞ্জীবিত করেন। বস্তুতঃ তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হন।

আ'লা হযরত সম্পর্কে পীর-মাশায়েখগণের ভাষ্য ঃ

আল্লামা হেদায়াতুল্লাহ্ সিন্দী মোহাজির মাদানী বলেন-

তিনি একজন প্রতিভাধর, নেতৃত্ব দানকারী আলেম, তাঁর সময়কার প্রখ্যাত আইনবিদ এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সুন্নাহ্‌র দৃঢ় হেফাজতকারী, বর্তমান শতাব্দীর ধর্মীয় পুণর্জ্জীবন দানকারী, যিনি "দ্বিনে মতিন" এর জন্য সর্বশক্তি দ্বারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাতে শরীয়তের হেফাযত করা যায়। "আল্লাহর পথের" ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের প্রতি তিনি তোয়াক্কা করেননি। তিনি দুনিয়াবী জীবনের মোহ সমূহের পিছু ধাওয়া করেননি- বরং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা সুচক কিতাব রচনা করতেই বেশী পছন্দ করেছিলেন। হুযুর পূরণূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেমের ভাবোন্মত্বতায় তিনি সর্বদা মশগুল ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। সাহিত্যিক সৌন্দর্য মন্ডিত ওপ্রেম ভক্তিতে ভরপুর তাঁর"নাতিয়া পদ্যের" মূল্য যাচাই করা একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁর প্রাপ্য-পুরস্কারও ধারণার অতীত। মাওলানা আব্দুল মোস্তফা শায়েখ আহ্‌মদ রেযা খাঁন- হানাফী কাদেরী সত্যিই পান্ডিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খেতাব পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন। (১৯২১ সালের প্রদত্ত বক্তব্য, তথ্যসূত্র ঃ মা'আরিফে রেযা করাচী, ১৯৮৬ খৃঃ পৃষ্ঠা নং-১০২)

জিয়াউল মাশায়েখ আল্লামা মোহাম্মদ ইব্রাহীম ফারুকী মোজাদ্দেদী, কাবুল, আফগানিস্তান ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বলেন- নিঃসন্দেহে মুফতী আহ্মদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহঃ) ছিলেন একজন মহাপন্ডিত। মুসলমানদের আচার-আচণের নীতিমালার ক্ষেত্রে তরীকতের স্তরগুলো সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। ইসলামী চিন্তা-চেতনার ব্যাখ্যা করন এবং প্রতিফলনের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা এবং বাতেনী জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি উচ্চসিত প্রশংসার দাবীদার। ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলনীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরিশেষে, একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এ আক্বিদা বিশ্বাসের মানুষের জন্য তাঁর গবেষণাকর্ম আলোকবর্তিকা হয়ে খেদমত আঞ্জাম দেবে। (মকবুল আহ্মত চিশতী কৃত পায়গামাতে ইয়াওমে রেযা, লাহোর, পৃঃ- ১৮)

আল্লামা আতা মোহাম্মদ বান্দইয়ালভী, সারগোদা, পাকিস্তান

তিনি মন্তব্য করেন- হযরত বেরলভী (ইমাম আহ্মদ রেযা) সহস্রাধিক কেতাব লিখেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর সার্বক্ষণিক উজ্জ্বল কর্ম হলো কুরআন মজীদের সঠিক উর্দু অনুবাদ গ্রন্থ "কানযুল ইমান"। এর কোন তুলনা নেই। এই মহা সৌধসম কর্মের মূল্যায়ন শুধু সেই সকল জ্ঞান বিশারদই করতে পারবেন- যাদের উর্দু ভাষায় লিখিত অন্যান্য উন্নতমানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থের জ্ঞান আছে। (পয়গামাতে ইয়াওমে রেযা, পৃঃ ৪৭)

উলামা ও বুদ্ধিজীবিদের অভিমত ঃ

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দিন, উপাচার্য, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় ভারত

তাঁর ভাষ্য হলো- শিষ্টাচার ও উন্নত নৈতিকতা সমৃদ্ধ কোনো ব্যক্তি যখন কোনো শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষিত না হয়েই গণিতশাস্ত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ধারণ করেন- তখন তাকে খোদা প্রদত্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে। আমার গবেষণা ছিল একটি তত্ত্ব বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে। কিন্তু ইমাম সাহেবের পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাবলী ছিল স্বতঃস্ফুর্ত; এ যেন-বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই তাঁর গভীর গবেষণা রয়েছে। ভারতে এত সিদ্ধ ব্যক্তি আর কেউ নেই। এত উচুঁ মাপের পণ্ডিত আমার মতে আর কেউ নেই। আল্লাহ্ তাঁর মাঝে এমন এক

জ্ঞান নিহিত রেখেছেন- যা সত্যি বিস্ময়কর। গণিত, ইউক্লিড, আলজেবরা ও সময় নির্ণয়-ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি চমকপ্রদ। একটি গাণিতিক সমস্যা- যা আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারিনি- তা এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাখ্যা করে দিলেন। (মোহাম্মদ বুরহানুল হক কৃত একরামে ইমাম আহ্মদ রেযা, লাহোর, পৃঃ ৫৯-৬০)

আল্লামা আলাউদ্দিন সিদ্দিকী, উপাচার্য, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তান ঃ

তিনি বলেন- বিভিন্ন ধর্মের মাঝে দ্বীন ইসলাম যেমন স্বাতন্ত্রমন্ডিত, ঠিক তেমনি মুসলমান চিন্তাবিদদের বিভিন্ন ধারায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতে মৌলিক ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো অবহেলিত হচ্ছিল। সেই সংকটময় সন্ধিক্ষণে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন আবির্ভূত হন এবং সংগ্রাম করে সেগুলোকে স্ব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাওলানা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইমামে আহ্লে সুন্নাত। মুসলমানদের উচিত- তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করা। (আবদুন্নবী কাওকাব প্রণীত মাকালাতে ইয়াওমে রেযা, ১১তম খন্ড, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ-১৭)।

ডঃ মোহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী- প্রতিষ্ঠাতা, তাহরিকে মিনহাজুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান ঃ

দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে মাওলানা আহ্মদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহঃ) সাহেবের বহুমুখী খেদমতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি একজন ব্যাখ্যাকারী ও একজন আবিষ্কারক বলেই প্রতীয়মান হয়। ঈমান, আক্বিদা ও গোষ্ঠীগতভাবে তাঁকে আবিষ্কারক ও ব্যাখ্যাকারী বলেই মনে হয়। সর্বশেষে তরীকতের ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি হলেন মোজাদ্দেদ (নবায়নকারী)। (ডঃ তাহিরুল কাদেরী রচিত-হযরত মাওলানা আহ্মদ রেযা খাঁন বেরেলভী কা এল্মী নযম, লাহোর, ১৯৮৮ পৃঃ ১৫।)

ডঃ হাসান রেযা খাঁন আযমী, পাটনা, ভারত ঃ

তিনি মন্তব্য করেন- আ'লা হযরতের জ্ঞানদীপ্ত গবেষণাকর্ম ফতোয়ায়ে রেযভীয়া-অধ্যয়ন করে আমি তাঁর নিম্নলিখিত বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।

ক) আইনবিদ হিসাবে তাঁর আলোচনা পর্যালোচনা, তাঁর সুদুর প্রসারী ভাবনা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁর তুলনাহীন পান্ডিত্যকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিফলন করে।

খ) আমি তাঁকে একজন উঁচুমানের ইতিহাসবিদ হিসাবে পেয়েছি- যিনি আলোচ্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দেয়ার জন্য বহু ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করতে সক্ষম ছিলেন।

গ) আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানের পাশাপাশি নাতিয়া পদ্যের পংক্তিতে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলেই দৃশ্যমান হচ্ছে।

ঘ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা করার সময় তাঁকে হাদীসশাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ পন্ডিত বলেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ঙ) তাঁর বিভিন্ন কর্মে তাঁকে শুধু একজন প্রখ্যাত আইনবিদই নয়- বরং অসাধারণ পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদ হিসাবে পাওয়া যায়- যেসব বিষয়ে তাঁর বিশেষজ্ঞ মতামত বিষয়াবলী সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাপৃত। (ডঃ হাসান রেযা খাঁন কৃত ফকীহে ইসলাম, এলাহাদবাদ, ১৯৮১, পৃঃ- ১২/১৩)।

বিদেশী অধ্যাপকবৃন্দের অভিমত ঃ

অধ্যাপক ডঃ মহিউদ্দিন আলাউয়ী, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর ঃ

তিনি বলেন- "একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিদ্যার প্রতিভা ও কাব্যগুণ কোন ব্যক্তির মাঝে একসাথে সমন্বিত হয় না। কিন্তু আহ্মদ রেযা খাঁন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর কীর্তি এ রীতিকে ভুল প্রমানিত করে। তিনি কেবল একজন স্বীকৃত জ্ঞান বিশারদই ছিলেন না- বরং একজন খ্যাতনামা কবিও ছিলেন"। (সাওতুশ শারক, কায়রো, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পৃঃ ১৬/১৭)

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গাদ্দা, ইবনে সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব ঃ

তাঁর বক্তব্য হলো- "একটি ভ্রমনে আমার সাথে এক বন্ধু ছিলেন- যিনি ফতোয়ায়ে রেযভীয়া (ইমাম সাহেবের ফতোয়া) গ্রন্থখানা বহন করছিলেন। ঘটনাচক্রে আমি একটি ফতোয়া পাঠ করতে সক্ষম হই। এর ভাষার প্রাচুর্য, যুক্তির তীক্ষ্নতা এবং সুন্নাহ ও প্রাচীন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। আমি নিশ্চিত-

এমন কি, একটি ফতোয়ার দিকে এক নজর চোখ বুলিয়েই নিশ্চিত যে- এই ব্যক্তিটি বিচার বিভাগীয় অন্তর্দৃষ্টি সমৃদ্ধ একজন মহাজ্ঞানী আলেম"। (ইমাম আহমদ রেযা, আরবার ইত্যাদি, পৃঃ- ১৯৪)।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পন্ডিতবর্গের অভিমত ঃ

ডঃ বারবারা, ডি, ম্যাটকাফ, ইতিহাস বিভাগ বারকলী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

তিনি অভিমত পেশ করেন- "ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অসাধারণ ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির একটি ঐশীদান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ডঃ জিয়াউদ্দিনের একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন- অথচ এর সমাধাণের জন্য ডঃ জিয়াউদ্দিন জার্মান সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন"। (মা'আরিফে রেযা ১তম খন্ড আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ, ১৯৯১ পৃঃ-১৮)

অধ্যাপক ডঃ জে.এম.এস. বাজন- ইসলামতত্ত্ব বিভাগ, লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়, হল্যান্ড ঃ

ডঃ মাসউদ আহমদের নিকট প্রেরিত তাঁর বক্তব্য হলো- "ইমাম সাহেব একজন বড় মাপের আলেম। তাঁর ফতোয়াগুলো পাঠের সময় এই বিষয়টি আমাকে পুলকিত করেছে যে- তাঁর যুক্তিগুলো তাঁরই ব্যাপক গবেষণার সাক্ষ্য বহন করছে। সর্বোপরি- তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। আপনি (ডঃ মাসউদ আহমদ) সম্পূর্ণ সঠিক। পাশ্চাত্যে তাঁকে আরো অধিক জানা ও মূল্যায়িত হওয়া উচত- যা বর্তমানে হচ্ছে"। (ডঃ মাসউদ আহ্মদকে প্রেরিত পত্র, তাং- ২১-১১-৮৬ হতে সংগৃহিত)

ওহাবীদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রাঃ)ঃ

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী, থানা ভবন, ভারত ঃ

তিনি বলেন- "(ইমাম) আহ্মদ রেযা খাঁনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, যদিও তিনি আমাকে কাফের (অবিশ্বাসী) ডেকেছেন। কেননা, আমি পূর্ণ অবগত যে, এটা আর অন্য কোন কারণে নয়- বরং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর সুগভীর ও ব্যাপক ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত"। (সাপ্তাহিক চাতান, লাহোর, ২৩ শে এপ্রিল ১৯৬২)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবুল আ'লা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা, জামায়াতে ইসলামী ঃ

তিনি মন্তব্য করেন- "মাওলানা আহমদ রেযা খাঁনের পান্ডিত্যের উচুঁমান সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। বস্তুতঃ দ্বীনি চিন্তা-চেতনায় তাঁর মেধাকে স্বীকার করতেই হয়।" (মাকালাতে ইয়াওমে রেযা, ১ম ও ২য় খন্ড, পৃঃ- ৬০)

আ'লা হযরতের কারামাত সমূহ

(১) নবী বংশের প্রতি আ'লা হযরতের অপূর্ব সম্মান প্রদর্শন

ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) ভারতের বেরেলী শহরে অনুষ্ঠিতব্য কোন এক মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে পালকিতে চড়ে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর আলা হযরত পালকি বহনকারীদের থামতে বললেন। পালকি থামানো হলো। যারা কাঁধে নিয়েছিল-আ'লা হযরত তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন-নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে কেউ সৈয়দ (রাসুলের) বংশের লোক আছেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি-যে-ই হউন না কেন-আপনার পরিচয় দিন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলেন-আমি হলাম সৈয়দ বংশের লোক। তখন আ'লা হযরত বললেন-আপনি কেন এই কাজ করছেন? লোকটি বললেন-সৈয়দ বংশের লোকদের ভিক্ষা করা ও যাকাত নেওয়া জায়েয নেই। সেই জন্য শ্রমের কাজ করছি। তখন আ'লা হযরত বিচলিত হয়ে বললেন-আপনি পালকিতে উঠুন। আপনি আমাকে যতটুকু পথ চড়িয়েছেন, এর বিনিময়ে আমি আপনাকে সারা বেরেলী শহর কাঁধে করে চড়াব। কারণ হাশর ময়দানে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোটি কোটি বনী আদমের সামনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন-হে আহমদ রেযা! তুমি আমার আওলাদের কাঁধে উঠেছিলে কেন? তখন আমি প্রিয় নবীকে কি করে মুখ দেখাব? জগৎবিখ্যাত আলেম ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) নবীবংশের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন-তার তুলনা নেই।

(২) আ'লা হযরত এবং একজন অমুসলিম যাদুকর

হযরত মন্না মিয়া ছাহেব বর্ণনা করেন-আমার পীর ও মুর্শিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) মসজিদ হতে নামায শেষে স্বীয় মহল্লা সওদাগরার দিকে আসছিলেন। পথে দেখতে পেলেন-এক গলিতে কিছু মানুষের ভীড় লেগে আছে। আ'লা হযরত কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন-এখানে কিসের এত ভীড় লেগে আছে? একজন জবাব দিল- এক অমুসলিম যাদুকর তার যাদু প্রদর্শন করছে। দেখা গেল-সেই যাদুকর তিন কুলু পানি একটি পাত্রে নিয়ে উঠাচ্ছেন। আ'লা হযরত তার নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন- আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুনেছি-তুমি নাকি তিন কুলু পানি একটি পাত্রে নিয়ে উপরে উঠাচ্ছো। লোকটি বললো-জ্বি হ্যাঁ। আ'লা হযরত বললেন- অন্য জিনিসও কি উঠাতে পারো? তখন সে বলল-হ্যাঁ, যা দিবেন তাই উঠাতে পারবো। তখন আ'লা হযরত নিজের জুতা পা হতে খুলে তাকে দিয়ে বললেন- এই জুতা উঠানো তো দুরের কথা-আগে তা জায়গা হতে সরিয়ে দেখাও তো। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, আ'লা হযরত নাগ্‌রাহ জুতা পরিধান করতেন-যা পঞ্চাশ গ্রাম ভারী ছিল। যা হোক-ঐ যাদুকর সেই জুতা মুবারক অনেক চেষ্টা করেও স্বীয় স্থান হতে কিঞ্চিত পরিমানও নাড়াতে পারলো না।

আ'লা হযরত বললেন- আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি শুধু ঐ পাত্রটাকে উঠিয়ে দেখাও। তখন সে ঐ পাত্রটাকে উঠাতে চাইল। তাও উঠাতে পারলনা। যাদুকর এই কারামত দর্শন করে আ'লা হযরতের কদমে পড়ল এবং সাথে সাথে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। আ'লা হযরতের রূহানী দরবার থেকে অসংখ্য ফয়ুযাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। (তজল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেযা-৭৭ পৃষ্ঠা)।

৩। আ'লা হযরতের দোয়ায় হাজী বহণকারী জাহাজ রক্ষা পেল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে- ১২৯৫ হিজরী সনে যখন আমি পিতা-মাতার সাথে প্রথম হারামাঈন শরীফাইন যিয়ারতে গেলাম- তখন আমার বয়স ২৩ বছর। প্রত্যাবর্তনকালে তিনদিন ব্যাপী ভীষণ তুফান প্রবাহিত হয়েছিল- যার বর্ণনা দিতে গেলে দীর্ঘ পরিসরের প্রয়োজন। লোকেরা তুফানের প্রবণতা দেখে কাফনের কাপড় পরিধান করে ফেলেছিল। আমার পিতা মাতার শঙ্কা দেখে তাদের হৃদয়ে শান্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে হঠাৎ আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো- আপনারা আত্মবিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর কসম, এই জাহাজ ডুববেনা। (বলা বাহুল্য, এই কসম খেয়েছিলাম ঐ হাদীসের উপর নির্ভর করে- যাতে নৌকা ডুবা থেকে রক্ষা পাওয়ার দো'আ এরশাদ হয়েছে)। আমি ঐ দোয়া পড়ে নিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগ দান করলাম এবং সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! সেই প্রচন্ড তুফানের সমাপ্তি ঘটল এবং জাহাজ মুক্তি পেল। (তজল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেযা- ১১৯ পৃষ্ঠা)।

(৪) ছেড়ে যাওয়া ট্রেন ফেরৎ আসলো

আ'লা হযরতের সুযোগ্য খলিফা মিরেঠ নিবাসী মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ছাহেব একবার বেরেলী শরীফে এসেছিলেন। একদিন ফযর নামাযান্তে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। রেলষ্টেশনে যাওয়ার জন্য দু'চাকা বিশিষ্ট টাঙ্গার মধ্যে মালামাল তুললেন। অতঃপর স্বীয় পীর আ'লা হযরতের কাছ থেকে বিদায় অনুমতি নেয়ার জন্য তাঁর দরবারে গেলে তিনি বললেন- নাশতা করেই যাও- ইন্‌শআল্লাহ্ ট্রেন পাবে। একথা শুনে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, ট্রেন ছাড়ার আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকী। তবুও আ'লা হযরতের কথা মোতাবেক তাই করলেন। একটু দেরীতে নাশতা আসল। তিনি নাশতা করে বিদায় নিয়ে টাঙ্গায় উঠে গেলেন। তখনও তিনি আশংকাবোধ করছিলেন। কিন্তু তার অন্তরে এই ভরসা ছিল যে, আ'লা হযরত তো আমাকে ট্রেন পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যথারীতি টাঙ্গা ষ্টেশনে পৌছল। কুলি টাংগা হতে মালামাল নামাতে নামাতে বলল, ট্রেনতো ছেড়েছে আধ ঘন্টা হয়ে গেলো। তখন হাবীবুল্লাহ ছাহেব তাঁর পীরভাই এসিসটেন্ট ষ্টেশন মাষ্টার- এর দপ্তরে গেলেন এবং বললেন- আ'লা হযরত কেবলা তো আমাকে ট্রেন পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এভাবে আরো অনেক কথা চলছিল। ঠিক সেই সময় টেলিফোনে খবর এলো-কিছুক্ষণ আগে যে ট্রেন ছেড়েছে- পথিমধ্যে ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়ায় তা আবার ফিরে আসছে। তখন তাঁর মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হলো। অতঃপর কিছুক্ষণ মেরামত করার পর পুনরায় যখন ট্রেন চালু করা হলো- তখন তিনিও ট্রেনে উঠলেন এবং চলে গেলেন। (আযকারে হাবীব লাহোর-২৮ পৃষ্ঠা)।

(৫) মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগমনকারীর নাম পূর্বেই বলে দিলেন

ভারতের পীলিভিত নামক স্থানের অধিবাসী প্রসিদ্ধ বুযুর্গ শাহ আহমদ শের খাঁন- যিনি শাহজী মোহাম্মদ শের মিয়া নামে সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে হাফেয ইয়াকুব আলী খাঁন ছাহেব মুরীদ হওয়ার বাসনা নিয়ে গেলেন। শাহ্‌জী মিয়া (রহঃ) হাফেয ছাহেবকে বললেন- আপনি মুরীদ হয়ে কি করবেন? হাফেয ইয়াকুব ছাহেব বললেন- আপনি মাদারজাদ ওলী। আমাকে আপন মুরীদগণের অন্তর্ভুক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করুন। শাহজী মিয়া (রহঃ) পুনরায় উক্ত কথা বললেন। তৃতীয়বার যখন ইয়াকুব ছাহেব আরয করলেন- তখন শাহ্জী মিয়া (রহঃ) বললেন- আপনার বাইয়াতের স্থান লাওহে মাহফুযে- আমার এখানে নয়। আপনি বেরেলী শরীফ যান এবং সেখানকার অধিবাসী ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করুন।

উল্লেখ্য, ঐসময় বেরেলীতে মাত্র একখানা ট্রেন আসা যাওয়া করতো। হাফেয মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব ঐ ট্রেনে বেরেলী শরীফ রওনা দিলেন। সেদিন ছিল ১৮ই জিলহজ্ব- আলা হযরতের সম্মানিত পীর শাহ আলে রাসূল মারহারাভী (রহঃ)-এর ওফাত বার্ষিকী। এতদ-উপলক্ষে আ'লা হযরত বেরেলীতে ওরছ পালন করছিলেন। সেখানে উপস্থিত আ'লা হযরতের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব পীলিভীতি এবং মাওলানা হাবিবুর রহমান ছাহেবকে আ'লা হযরত আদেশ করলেন, আপনারা ষ্টেশনে যান। এখন ট্রেনে করে হাফেয সাহেব তশরীফ আনছেন। তাঁকে বেরেলী শরীফ নিয়ে আসুন। আ'লা হযরত শুধু হাফেয ছাহেব বলেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেননি- আর শিষ্যরাও জিজ্ঞেস করেননি। যখন তাঁরা ষ্টেশনে পৌছলেন-হাফেয সাহেব ট্রেন থেকে নামলেন। তারা উভয়ে তাঁকে চিনে ফেললেন- এবং হাফেয সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কোথায় যাবেন? তিনি আ'লা হযরতের ঠিকানা বললেন। মাওলানা হাবিবুর রহমান বললেন, আ'লা হযরত (রহঃ) তো আমাদেরকে আপনার পরিচয় সহ আপনার আসার কথা বলে আপনাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। হাফেয সাহেব রীতিমত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁকে সওদাগরা মহল্লায় নিয়ে আসা হল। গিয়ে দেখা গেলো- আ'লা হযরত মুরীদগণকে নিয়ে হাফেয সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য মহল্লার প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন। হাফেয সাহেবকে দেখে আ'লা হযরত তাঁর সাথে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করলেন। পরে যখন হাফেয সাহেব বাইয়াতের বাসনা প্রকাশ করলেন- তখন আ'লা হযরত তাঁর হাত স্বীয় হাতের নীচে নিয়ে বাইয়াত করালেন। (আলহাজ্ব আমানত রসুল কাদেরী প্রণীত তজল্লীয়াতে ইমাম আহমদ রেযা ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা, ১৯৮০ সাল)।

(৬) সাক্ষাৎকারীদের মনের কথা বলে দিলেন-

ছদরুল আফাযেল মাওলানা নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) ও শায়খুল মোহাদ্দেসীন সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ দিদার আলী সাহেব (রহঃ)-উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো। একবার তিনি যখন মুরাদাবাদ সফরে এলেন, তখন নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) বললেন- বেরেলী শরীফে আ'লা হযরত নামে একজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তি রয়েছেন। চলুন-তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। শায়খুল মোহাদ্দেসীন বললেন- আমি তাঁর সম্বন্ধে জানি। তিনি পাঠান বংশীয় লোক- যার মেযাজ অত্যন্ত কড়া এবং অত্যন্ত রাগী। ছদরুল আফাযেল মাওলানা নাঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) তাকে এক প্রকার জোর করেই বেরেলী শরীফ নিয়ে এলেন। বেরেলী পৌছার পর তাঁরা যখন আ'লা হযরতের সাক্ষাৎলাভ করলেন- তখন মুসাফাহা ও কোলাকুলির পর মোহাদ্দেস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন- হুযুর! আপনার মেযাজ শরীফ কেমন? আ'লা হযরত বললেন- সৈয়দ সাহেব! কি জিজ্ঞাসা করছেন? "আমি পাঠান বংশীয় লোক- মেযাজ কঠিন এবং অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির"। একথা শুনে উভয়ে অবাক হয়ে গেলেন যে- আমরা দুজনে মুরাদাবাদে এই কথা আলোচনা করেছিলাম, আর আ'লা হযরত তা এখানে কিভাবে শুনলেন? তখন উভয়ে আ'লা হযরতের হাত চুম্বন করলেন। ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রেজভীয়্যায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন সাথে সাথে তিনি খেলাফতও পেয়ে গেলেন। (তজল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেযা-৫৬ পৃষ্ঠা)।

(৭) কুকুর রেয়াদবে রাসুল নয়-তাই তাকে ওহাবী বলা যাবে না

বিশ্ববিখ্যাত মোহাদ্দিস সুরতী সাহেবের নাতি হযরত শাহ মুন্না মিয়া সাহেব বলেন-"আমার সম্মানিত পিতা সুলতানুল ওয়ায়েজিন মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব রেজভী পিলীভিতী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-এর খেদমতে বেরেলী শরীফে হাযির হলেন। তখন তিনি দারুল ইফতার সম্মুখে একটি কুকুর দেখতে পেলেন এবং একজনকে বললেন- এই ওহাবীটাকে তাড়িয়ে দাও। তখন আ'লা হযরত তা শুনামাত্র বললেন- মাওলানা! ঐ কুকুরতো কখনো সরকারে দো আলমের শানে মিথ্যা অপবাদ দেয়নি। সুতরাং আপনি যা বললেন- তা ফিরিয়ে নিন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়ে যান। কারণ, কুকুর অপবিত্র হতে পারে-কিন্তু কখনই রাসুলে পাকের শানে বেয়াদবীকারী নয়। সুতরাং তাকে ওহাবী বলবেন না। ওহাবীরা বেয়াদব- কিন্তু কুকুর বেয়াদব নয়। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-১৫২ পৃষ্ঠা)।

(৮) "আমি তাকে ফাঁসি থেকে মুক্ত করে দিলাম"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের দিকে আলী খান ছাহেব নামক আ'লা হযরতের এক মুরীদ ভাইসুড়ি গ্রামে শিকারে গেলেন। সেখানে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে একটি মানুষের গায়ে গুলি লেগে গেল। সাথে সাথে লোকটি প্রাণ হারাল। অতঃপর আলী খান ছাহেবকে গ্রেফতার করা হল এবং তার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যা মামলা দায়ের করা হল। যথারীতি ফাঁসিরও হুকুম জারী করা হল। আ'লা হযরতের খেদমতে কয়েকজন ভক্ত গিয়ে জানালেন-হুযুর! আলী খান ছাহেবের তো ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। তার জন্য দোয়া করুণ। আ'লা হযরত (রহঃ) বললেন-**"যাও, আমি তাকে ফাঁসি থেকে মুক্তি দিয়ে দিলাম"**।

ফাঁসির নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে কযেকজন লোক আলী খান ছাহেবের সাক্ষাতে গেলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আলী খান ছাহেব তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন- তোমরা বাড়ি ফিরে যাও, চিন্তার কিছু নেই। আমি বাড়ী ফিরে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করব। কেননা, আমার মুর্শিদে বরহক আ'লা হযরত তো বলেই দিয়েছেন যে, আমার ফাঁসি কার্যকর হবেনা। আপনারা ঘরে যান, আমি আসছি। এসেই নাস্তা করব-ইনশা আল্লাহ অতঃপর আলী খান ছাহেবকে ফাঁসী কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হল এবং রীতি অনুসারে জিজ্ঞাসা করা হলো- আপনার শেষ ইচ্ছা কি? তখন তিনি বললেন- জিজ্ঞাসা করে কি হবে? আমার সময়তো এখনো ফুরিয়ে আসেনি। সবতো ভালই আছে। উপস্থিত সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল- এই কারণে যে, যাঁর গলায় ফাঁসির রশি লাগানো হয়েছে- তার এই আশ্চর্য্য মনোভাব কেন? ঠিক তখনই একটি নির্দেশ এল- "বৃটিশ শাসকের ছেলের মুকুট ধারণ উপলক্ষে কিছু সংখ্যক কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হোক"। তৎক্ষনাৎ আলী খান ছাহেবকে ফাঁসি কাষ্ঠ হতে মুক্তি দেয়া হলো।

(৯) কুয়ার পানি উপরে উঠে এলো

১৩২৩ হিজরী সনে আ'লা হযরত (রহঃ) যখন দ্বিতীয়বারের মতো হজ্বে বায়তুল্লাহ সম্পন্ন করতে গেলেন- তখন হজ্বের সমস্ত ফরয সমূহ শেষ করলেন এবং মদীনা শরীফে যাওয়ার মনস্থ করলেন। তৎকালীন সময়ে যারা হজ্বে যেতেন, তাদেরকে উট-গাধার উপর আরোহন করেই যেতে হতো- যার দরুণ অনেক সময় লাগতো। আজকাল তো প্রায় দিনে দিনেই পৌছানো সম্ভব।

যা হোক- আ'লা হযরতের কাফেলা যখন মদিনা শরীফে গিয়ে পৌছল-তখন যোহর নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা পানির তালাশে বের হলো। আ'লা হযরতও একদিকে পানির তালাশে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হল- যেন এখানকার সকলস্থান তাঁর পূর্বপরিচিত। তিনি কিছুটা সামনে গিয়ে একটা কুয়া দেখতে পেলেন- যা অনেক গভীর ছিল। আ'লা হযরতের খাদেম হাজী কেফায়াতুল্লাহ ছাহেব একটি বালতিতে লম্বা রশি বেধে কুয়ায় ফেললেন। অতঃপর পানি পাওয়া গেল। তখন সবাই সেই পানি নিয়ে এদিক ওদিক ইস্তিনজা করে ফিরে এসে দেখল-আ'লা হযরত ঐ কুয়া হতেই পানি তুলছেন এবং অন্য একটি পাত্রে রাখছেন। কাছে গিয়ে দেখা গেল- আ'লা হযরত মাত্র কয়েক হাত রশি দিয়ে পানি তুলছেন। যখন খাদেম আ'লা হযরতের কাছে জানতে চাইলেন- হুযুর! কুয়ায় পানি এতই নিচে ছিল যে, রশির সাথে আমার পাগড়ি জোড়া দিতে হয়েছিল- অথচ আপনি মাত্র কয়েক হাত রশি দিয়ে কিভাবে পানি তুললেন? আযীমূল বরকত আ'লা হযরত স্বীয় কারামত লুকাতে গিয়ে বললেন- হাজী ছাহেব, আপনি কুয়ার যে দিক থেকে পানি তুলছিলেন, সেই দিকটা ছিল নিচু। সুতরাং বালতির রশিতে কিছুটা পার্থক্য তো হবেই- তাই নয় কি?

(১০) দেড় হাজার কিতাবের রচয়িতা

চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ, শরীয়তে মোহাম্মদীর সাহায্যকারী আ'লা হযরত আযীমূল বরকত ইমামে আহ্লে সুন্নাত ফখরে জমীন ও জমান আল্লামা মাওলানা হাফেয ক্বারী মুফতি আলহাজ্ব শাহ মোখতার আব্দুল মোস্তফা মোহাম্মদ আহমদ রেযাখাঁন ছাহেব (রহঃ)-এর বড় কারামত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল এই যে, মুধুমাত্র ৬৮ বৎসর হায়াতের মধ্যে ৫৪ বৎসরে তিনি দেড় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছেন। মাশায়েখে কেরাম বর্ণনা করেছেন- আ'লা হযরতের রচিত ফতোয়ার অন্যতম কিতাব "ফতোয়ায়ে রেজভিয়্যাহ" বার খন্ডে বিভক্ত। এটা সহজেই অনুমেয়- ঐ কিতাব এমন বৃহৎ যে, অন্য কেউ ৫৪ বৎসরে কেন- শত বৎসরেও রচনা করতে পারবে কিনা সন্দেহ। সেই কিতাবের পুরো নাম (আল আতায়া নব্বীয়াহ্ ফী-ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ্)। বর্তমান মূল্য আঠারো হাজার টাকা।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আ'লা হযরত ৬৮ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। এর মধ্যে শৈশব কৈশোর মিলিয়ে চৌদ্দ বৎসর বাদ দিয়ে বাকী ৫৪ বছরে ৫৫টিরও অধিক জ্ঞান শাখায় দেড় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ! এতেই প্রমানিত হয়- তিনি ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপযুক্ত নায়েবে নবী। তিনি ছিলেন মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত। আ'লা হযরত আযীমূল বরকতের জ্ঞানের গভীরতা, যোগ্যতা, কারামত, বেলায়েত সহ সমস্ত জ্ঞানের ধারণা লাভ করে বিশ্বের মনিষীগন তাঁকে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

(১১) তুফান থেকে নৌকা উদ্ধার

আ'লা হযরতের খলিফা সদরুশ শরিয়া হযরত মাওলানা আমজাদ আলী (রহঃ) বলেন-

"আমরা একদিন আ'লা হযরত (রহঃ)-এর নিকট হাদীসের ছবক নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি অভ্যাসের বিপরীত সেখান থেকে উঠে বের হয়ে গেলেন। দশ পনেরো মিনিট পর তিনি কিছুটা চিন্তাযুক্ত ও পেরেশান অবস্থায় ফিরে আসলেন। আমরা দেখতে পেলাম-হুযুরের দুই হাত জামার আস্তিন সহ ভিজা। তিনি আমাকে (আমজাদ আলী) মসজিদের বাইরে ডেকে আনলেন এবং একটা শুকনো জামা নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি শুকনো জামা পরিধান করে পুনরায় হাদীসের দরস দিতে লাগলেন। আমার অন্তরে এই আজব ঘটনায় খটকা লেগে গেল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করে ঐ দিন ও তারিখ এবং সময় লিখে রাখলাম- দেখি কি হয়।

এর এগার দিন পরে একদল লোক হাদীয়া ও তোহ্ফা নিয়ে হাযির হলো। কয়েকদিন থাকার পর তাদের বিদায়ের সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম- আপনারা কোন্ দেশের লোক, কোথেকে এসেছেন এবং কিভাবে এসেছেন? তাঁরা বললেন- আমরা অমুক দিন নৌকায় আরোহী হয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। নদীতে তুফান শুরু হলো এবং তরঙ্গমালার আঘাতে আমাদের নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলো, আমরা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (মাঃজিঃ)-এর নামে মানত করে তাঁকে উছিলা ধরে দোয়া করলাম। হঠাৎ করে একজন লোক এসে নৌকার একপাশ ধরে টেনে ঘাটে লাগিয়ে দিল। এভাবে আ'লা হযরতের নামের উছিলায় আল্লাহপাক আমাদেরকে গায়েবী লোক দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন। আমরা ঐ মানতের হাদীয়া নিয়ে আ'লা হযরতের যিয়ারতে এসেছি। মাওলানা আমজাদ আলী (রহঃ) বলেন- এখন বুঝতে পারলাম- ঐ দিন আ'লা হযরতের হাত ও আস্তিন ভিজা ছিল কেন। (হায়াতে আ'লা হযরত)।

"ডাল দি কল্ব মে আযমতে মোস্তফা
ছাইয়েদী আ'লা হযরত পে লাখো ছালাম"।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের নাম: হাফেজ মোঃ আব্দুল জলিল। আক্বিদা-বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী।

পিতার নাম: মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নাম:** মালেকা খাতুন।

জন্ম: ২৬ শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্মস্থান: গ্রাম: আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানা: মতলব (উঃ), জেলা: চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহ্‌বিদ আলিম ও বাদশাহ্ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) ছিলেন লেখকের উর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) রচিত ফেকাহ্‌র নীতিশাস্ত্র নূরুল আনোয়ার গ্রন্থখানা দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ফাযিল জামায়াতের পাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ)-এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন: লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফয আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে ১৯৫৩ ইং হিফয শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬-১৯৬৪ ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর চট্টগ্রামে ইমামতি অবস্থায় ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম.এ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন ১৯৬৬-১৯৭০ ইং সালে। আরবি ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও লাকসাম ফয়জুন্নেছা কলেজে চার বৎসর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ্ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে এক বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ইং বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ইং সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ইং সাল পর্যন্ত ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৯০ইং চার বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে মসজিদের খতিব ও ওয়াজ নসিহত এবং আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বুখারী শরীফ সংকলনসহ তার লিখিত, অনুদিত ও সম্পাদিত ১৯ খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৯ ইং হতে মাসিক 'সুন্নীবার্তা' নিয়মিত প্রকাশ করছেন।

বিদেশ ভ্রমণ: ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফের হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)-এর মাজার শরীফসহ বহু মাজার জিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মো'তামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ মোদারেরছিন প্রতিনিধি দলের সাথে যোগদান করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং কারবালা ও বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাঃ)-এর মাজারসহ অসংখ্য নবী ওলীর মাজার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেইসাথে যথাক্রমে হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৯৯ইং সালে ১১ জনের কাফেলাসহ বাগদাদ শরীফ, বাইতুল মোকাদ্দাস, মদীনা শরীফ ও মক্কা শরীফ যিয়ারত করেন। ২০০২ সালে লন্ডন এবং ২০০৩ সালে সুইডেন, লন্ডন ও দুবাই সফর করেন। ২০০৪ইং থেকে নিয়মিত প্রতি বৎসর লন্ডন সফর করছেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্‌লে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে বহুতল বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আ'যম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃযিঃআঃ) তাঁকে হাতে লিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে নিজ খরচে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ: এপ্রিল, ২০০৭ইং

Pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের নাম: হাফেজ মোঃ আব্দুল জলিল। আক্বিদা-বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী।

পিতার নাম: মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নাম:** মালেকা খাতুন।

জন্ম: ২৬ শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্মস্থান: গ্রাম: আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানা: মতলব (উঃ), জেলা: চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহ্‌বিদ আলিম ও বাদশাহ্ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) ছিলেন লেখকের উর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) রচিত ফেকাহ্‌র নীতিশাস্ত্র নূরুল আনোয়ার গ্রন্থখানা দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ফাযিল জামায়াতের পাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ)-এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন: লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফয আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে ১৯৫৩ ইং হিফয শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬-১৯৬৪ ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর চট্টগ্রামে ইমামতি অবস্থায় ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম.এ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন ১৯৬৬-১৯৭০ ইং সালে। আরবি ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। হাগলনাইয়া কলেজ ও নাকসাম ফয়জুন্নেছা কলেজে চার বৎসর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ্ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে এক বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ইং বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ইং সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ইং সাল পর্যন্ত ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৯০ইং চার বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে মসজিদের খতিব ও ওয়াজ নসিহত এবং আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বুখারী শরীফ সংকলনসহ তার লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত ১৯ খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৯ ইং হতে মাসিক 'সুন্নীবার্তা' নিয়মিত প্রকাশ করছেন।

বিদেশ ভ্রমণ: ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফের হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ)-এর মাজার শরীফসহ বহু মাজার জিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মো'তামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ মোদারেরেছিন প্রতিনিধি দলের সাথে যোগদান করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং কারবালা ও বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাঃ)-এর মাজারসহ অসংখ্য নবী ওলীর মাজার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেইসাথে যথাক্রমে হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৯৯ইং সালে ১১ জনের কাফেলাসহ বাগদাদ শরীফ, বাইতুল মোকাদ্দাস, মদীনা শরীফ ও মক্কা শরীফ যিয়ারত করেন। ২০০২ সালে লন্ডন এবং ২০০৩ সালে সুইডেন, লন্ডন ও দুবাই সফর করেন। ২০০৪ইং থেকে নিয়মিত প্রতি বৎসর লন্ডন সফর করছেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি সুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে বহুতল বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আ'যম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃযিঃআঃ) তাঁকে হাতে লিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে নিজ খরচে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ: এপ্রিল, ২০০৭ইং

ইরফানে শরিয়াত ▫ অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ-বিসিএস)

عرفان شريعت

ইরফানে শরিয়াত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ

অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ-বিসিএস)